প্রকাশনার ৩৬ বছর

অগ্রপথিক

ডিসেম্বর ২০২১

মহান বিজয় দিবস সংখ্যা

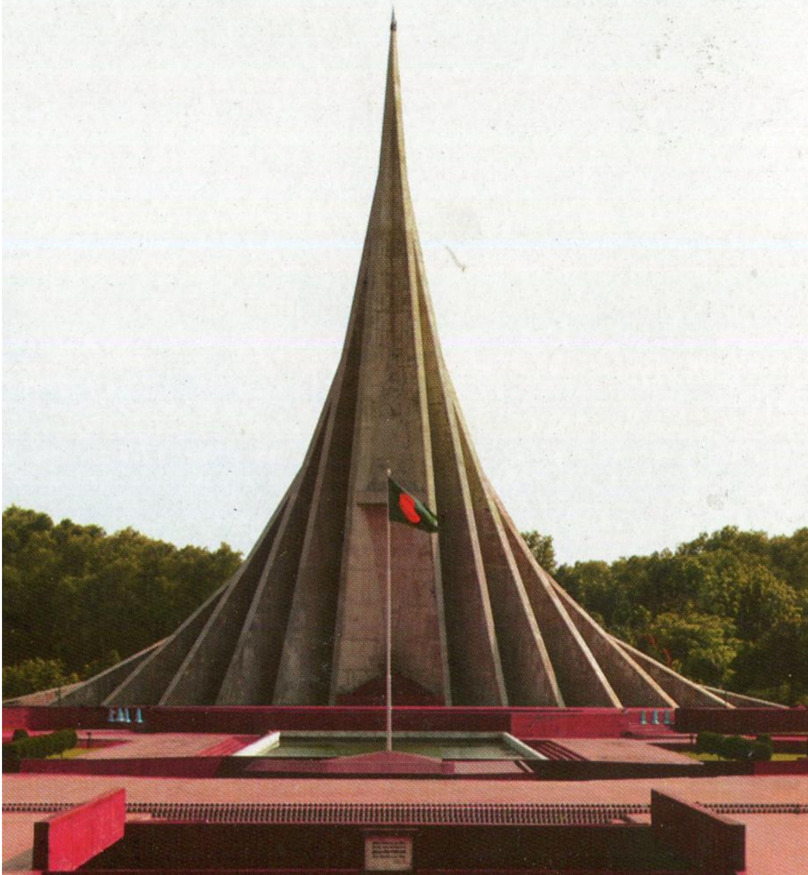

প্রকাশনার ৩৬ বছর

অগ্রপথিক

সৃ জ ন শী ল মা সি ক

ছত্রিশ বর্ষ ❑ সংখ্যা ১২

ডিসেম্বর ২০২১ ॥ অগ্রহায়ণ-পৌষ ১৪২৮ ॥ রবি. সানি-জমা. আউ.- ১৪৪৩

প্রধান সম্পাদক

ড. মোঃ মুশফিকুর রহমান

সম্পাদক

মোহাম্মদ আনোয়ার কবির

প্রকাশনা বিভাগ

ইসলামিক ফাউন্ডেশন

[প্রতিষ্ঠাতা : জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান]

আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অগ্রপথিক

নিয়মাবলী

- অগ্রপথিক ইসলামিক ফাউন্ডেশন-এর সৃজনশীল মাসিক মুখপত্র।
- ইসলামের সুমহান জীবনাদর্শ প্রচার ও প্রসারে বিতর্কের ঊর্ধ্বে থেকে প্রবন্ধ, নিবন্ধ, জীবনী, তথ্যমূলক ফিচারসহ সৃজনশীল লেখকদের গল্প, কবিতা, নাটক, স্মৃতিকথা, ইতিহাস-ঐতিহ্য, সাহিত্য-সংস্কৃতি,শিল্পকলা, অর্থনীতি, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ক লেখা প্রকাশ এবং মননশীল পাঠক তৈরি করা অগ্রপথিকের প্রধান উদ্দেশ্য। পাশাপাশি বিশ্ব মুসলিম ঐতিহ্যের সঙ্গে পাঠকদের পরিচিত করাও এর অন্যতম উদ্দেশ্য।
- উদ্দেশ্যের অনুকূলে যে কেউ তাঁর নির্বাচিত মূল্যবান লেখাটি অগ্রপথিক-এ প্রকাশের জন্য পাঠাতে পারেন, তবে অবশ্যই স্পষ্ট ও নির্ভুল হতে হবে। কাগজের দুই পৃষ্ঠায় গ্রহণযোগ্য নয়। অগ্রপথিক-এর ই- মেইল ঠিকানায়ও লেখা পাঠাতে পারেন। অমনোনীত লেখা ফেরত দেয়া হয় না। প্রকাশিত লেখার সম্মানী দেয়া হয়। লেখা সম্পাদকের বরাবরে পাঠাতে হবে।
- ইসলামিক ফাউন্ডেশনের কেন্দ্রীয় বিক্রয় শাখা (বায়তুল মুকাররম, ঢাকা) সহ বিভাগীয় ও জেলা কার্যালয়ে অগ্রপথিকসহ অন্যান্য প্রকাশনা কিনতে পাওয়া যায়।

প্রচ্ছদ
ফারজীমা মিজান শরমীন

মূল্য : ২০ টাকা

যোগাযোগ
সম্পাদক
অগ্রপথিক
প্রকাশনা বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর
ঢাকা- ১২০৭
ফোন : ৮১৮১৫১৯
E-mail : ifa.agropothik@gmail.com

সম্পাদকীয়

মহান বিজয় দিবস

প্রতিটি জাতির জীবনে যে দিবসগুলো তাকে সুমহান করে, দেশপ্রেমে উজ্জীবিত করে নিঃসন্দেহে তার মধ্যে বিজয় দিবস অন্যতম। হাজার বছর ধরে পরাধীন বাঙালি জাতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ সালে বিজয়ের লাল সূর্যটিকে করায়ত্ত করে। বাঙালির ইতিহাসে সর্বপ্রথম একটি স্বাধীন দেশের মালিক হলো তারা। আর এই স্বাধীনতার জন্য সর্বশেষ রক্তক্ষয়ী সশস্ত্র সংগ্রাম ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে জীবন উৎসর্গ করতে হলো ৩০ লক্ষ শহীদকে, চার লক্ষাধিক মা-বোনকে তাদের সম্ভ্রম বিসর্জন দিতে হলো। শুধুমাত্র তাই নয় এই স্বাধীনতার জন্য যুগ যুগ ধরে জেলখানায় কত সন্তান যে তার জীবন যৌবনকে উৎসর্গ করেছে সেটি জাতির ইতিহাসে আজীবন অমলিন হয়ে থাকবে। মুজিববর্ষে বিজয়ের এই পূর্তিতে আমরা গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, তাঁর সহযোদ্ধা নেতৃবৃন্দসহ মুক্তিযুদ্ধের শহীদ ও আজ পর্যন্ত দেশের জন্য জীবন উৎসর্গ করা শহীদদের।

বিজয় দিবস মহান রাব্বুল আলামিন আল্লাহ তাআলার অশেষ নিয়ামত। যুগে যুগে সত্য ও ন্যায়ের পথের আদর্শ ও সংগ্রামকে মহান রাব্বুল আলামিন বিজয় দান করেছেন। পৃথিবীর বুকে অত্যাচারী জুলুমের অবসানের জন্যই নিপীড়িত নির্যাতীত জনগণ মহান রাব্বুল আলামিনের অশেষ রহমত ও কৃপা লাভ করে থাকে। আমাদের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধ ছিল সত্য ও ন্যায়ের পথে জুলুম ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে নিপীড়িত জনগণের আত্মরক্ষার ও মানবতাবোধের যুদ্ধ। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে সেদিন সমগ্র জাতি ইস্পাত কঠিন দৃঢ় ঐক্যবদ্ধভাবে পাকিস্তানি হানাদারদের প্রতিরোধ করে সশস্ত্র যুদ্ধের মধ্য দিয়ে বিজয় ছিনিয়ে আনে। অত্যন্ত দুঃখজনক হলেও সত্য সেই যুদ্ধে পবিত্র ধর্ম ইসলামের নাম ভাঙ্গিয়ে এই দেশের রাজাকার, আল-বদর, আল-শামস'রা

যুদ্ধাপরাধের মতো ঘৃণিত অনৈসলামিক কার্যক্রম এই মাটিতে পরিচালনা করেছে। তারা ১৯৭১ সালে আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় পবিত্র ধর্ম ইসলামের অপব্যাখ্যা দিয়ে সকল অনৈসলামিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করেছিল, ইসলাম ধর্মকে কলঙ্কিত করতে অপচেষ্টা করেছিল। ভবিষ্যতে যাতে এই মাটিতে কেউ পবিত্র ধর্ম ইসলামের অপব্যাখ্যা দিয়ে কোন দেশ বিরোধী কর্মকাণ্ড করার সাহস না পায়, সে বিষয়ে আমাদের প্রত্যেককে সতর্ক ও সজাগ থাকতে হবে। মহান রাব্বুল আলামিন আমাদেরকে দেশ বিরোধী ও স্বাধীনতাবিরোধী কর্মকাণ্ড প্রতিহত করে স্বাধীনতা সমুন্নত রাখার তৌফিক বজায় রাখুন।

রোকেয়া দিবস

বাঙালি মুসলিম নারীদের জাগরণের পথিকৃৎ বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন। এই মহিয়সী নারী ৯ ডিসেম্বর ১৮৮০ সালে রংপুরের অজপাড়াগাঁ পায়রাবন্দ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯৩২ সালের একই দিনে কলকাতায় মৃত্যুবরণ করেন। মুসলিম নারী সমাজের পশ্চাৎপদতাকে পেছনে ফেলে দিয়ে সামনে এগিয়ে যাওয়ার প্রধানতম অনুপ্রেরণার নাম বেগম রোকেয়া। অশিক্ষা কুশিক্ষায় জর্জরিত পশ্চাৎপদ মুসলিম নারী সমাজকে শিক্ষার আলোয় আলোকিত করার জন্য উনিশ শতকে বেগম রোকেয়ার অবদান বাঙালি মুসলিম রেনেসাঁ। উনিশ শতকে ধর্মীয় গোঁড়ামির শৃঙ্খল, কুসংস্কারে আবদ্ধ বাঙালি মুসলিম নারী সমাজের শিক্ষার জন্য স্কুল প্রতিষ্ঠাসহ বিদ্যালয়ে নিয়ে আসার প্রথম ও প্রধানতম ব্যক্তি বেগম রোকেয়া। বাঙালি মুসলিম সফল নারী লেখিকা হিসেবেও বেগম রোকেয়া বাংলার ইতিহাসে স্মরণীয়। বেগম রোকেয়ার দেখানো পথ ধরে আজ বাঙালি মুসলিম নারী সমাজ সকল ক্ষেত্রে তার অবস্থান করে নিয়েছে। বেগম রোকেয়ার লেখাসমূহ সকল যুগে সকল সময়ে বাঙালি মুসলিম নারী সমাজের জন্য পাথেয়। ৯ ডিসেম্বর বেগম রোকেয়া দিবসে আমরা গভীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার সাথে মুসলিম নারী সমাজের আধুনিক প্রগতিশীলতার প্রতীক বেগম রোকেয়াকে স্মরণ করছি। বেগম রোকেয়ার স্বপ্নের আধুনিক প্রগতিশীল সুশিক্ষিত মুসলিম নারী সমাজ গঠনের জন্য বেগম রোকেয়ার পথ ধরে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা অক্লান্ত পরিশ্রম করে যাচ্ছেন। এই বিষয়ে এই সংখ্যায় লালমাটিয়া মহিলা কলেজের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সাবেক সহযোগী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান ড. মাহবুবা রহমানের একটি বিশেষ লেখা আমরা প্রকাশ করছি। প্রত্যাশা করি লেখাটির মধ্য দিয়ে আমাদের পাঠকগণ একটি নতুন অভিজ্ঞতা ও দৃষ্টিভঙ্গি লাভ করবেন।♦

সূচি

প্রবন্ধ-নিবন্ধ

মহান বিজয় দিবস

প্রফেসর ড. এ কে এম ইয়াকুব হোসাইন

স্বাধীনতার বিকাশ ও জাতির পিতার অবদান ♦ ০৯

ড. মাহফুজ পারভেজ

বঙ্গবন্ধু : সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি ♦ ২১

মুহাম্মদ মিযান বিন রমজান

ইসলামে দেশপ্রেম ও বঙ্গবন্ধুর ইসলামী খেদমত ♦ ৩৭

মুজিববর্ষ

শামস সাঈদ

গণতন্ত্র ও মুক্তির প্রতীক ধানমন্ডি ৩২ নম্বর ♦ ৪৮

শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস

মাহবুব রেজা

শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবসের প্রেক্ষাপট এবং আমাদের কর্তব্য ♦ ৬১

মুক্তিযুদ্ধ

ফয়সাল আহমেদ

একাত্তরে বাঘের মতো গর্জে ওঠেছিল সুন্দরবনের নদী ♦ ৭০

রোকেয়া দিবস

ড. মাহবুবা রহমান

বেগম রোকেয়ার স্বপ্ন বাস্তবায়নে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ♦ ৮২

কবিতা

সোহরাব পাশা
বঙ্গবন্ধুর ফেরা♦১০৫
দেলওয়ার বিন রশিদ
প্রিয় নাম বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান♦১০৬
মালেক মাহমুদ
বঙ্গবন্ধুর অমর কীর্তি♦১০৭
বাবুল তালুকদার
একাত্তরে মুক্তিযোদ্ধা♦১০৮
মিলন সব্যসাচী
বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ♦১০৯
গাজী সাইফুল ইসলাম
সিন্ধুর প্রতিটি বিন্দুতে আমি খুঁজি♦১১০
জুবাইর জসীম
সৃষ্টি সুখের গান♦১১১
আসিফ খন্দকার
অমর বঙ্গবন্ধু♦১১২

গল্প

মো. আবদুন নূর
ফরিয়াদ♦১১৩

সাহিত্য

আনোয়ার কবির
বাংলাদেশের বাঙালির অনিবার্য গ্রন্থ♦১২০

স্মরণ

মঈনুল হক চৌধুরী
ছান্দসিক কবি আবদুল কাদির : কম চেনা বড় মানুষ♦১২৪

পরশমণি

আল-কুরআন

১১। যারা আমার উদ্দেশ্যে সংগ্রাম করে আমি তাদেরকে অবশ্যই আমার পথে পরিচালিত করি। আল্লাহ্ অবশ্যই সৎকর্মপরায়ণদের সঙ্গে থাকেন। *(সূরা আনকাবুত: ৬৯)*

২। যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হল তাদের যারা আক্রান্ত হয়েছে, কারণ তাদের প্রতি জুলুম ও অত্যাচার হয়েছে। *(সূরা হজ্জ: ৩৯)*

৩। আল্লাহর পথে যারা শহীদ হয়েছে তাদেরকে তোমরা মৃত বলো না, বরং তারা জীবিত; কিন্তু তোমরা তা উপলব্ধি করতে পার না। *(সূরা বাকারা: ১৫৪)*

৪। তোমাদের কী হলো যে, তোমরা যুদ্ধ করবে না আল্লাহর পথে এবং অসহায় নর-নারী এবং শিশুগণের জন্য, যারা বলে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! এই জনপদ যার অধিবাসি জালিম, ইহা থেকে আমাদেরকে অন্যত্র নিয়ে যাও; তোমার নিকট থেকে কাউকে আমাদের অভিভাবক কর এবং তোমার নিকট হতে কাউকে আমাদের সাহায্যকারী বানাও। যারা মুমিন তারা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে এবং যারা কাফির তারা তাগুতের পথে যুদ্ধ করে। সুতরাং তোমরা শয়তানের বন্ধুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর; শয়তানের কৌশল অবশ্যই দুর্বল। *(সূরা নিসা : ৭৫-৭৬)*

৫। নিশ্চয়ই মহাকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টির দিন থেকে আল্লাহর বিধানে আল্লাহর কাছে মাস গণনায় মাস বারটি, তন্মধ্যে চারটি মাস সম্মানিত, এটিই সুপ্রতিষ্ঠিত বিধান; সুতরাং এর মধ্যে তোমরা নিজেদের প্রতি অত্যাচার করো না। *(সূরা তাওবা : আয়াত-৩৬)*

আল-হাদীস

১। মাতৃভূমি মক্কাকে ছেড়ে প্রিয় নবী (সা) অশ্রুসজল নয়নে মদীনার দিকে অগ্রসর হতে হতে মক্কাকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন: হায়রে আমার মাতৃভূমি মক্কা! দুনিয়ার জনপদগুলোর মধ্যে তুমিই আল্লাহর নিকট সবচেয়ে বেশি প্রিয়। আমি তোমাকে অন্যান্য ভূখণ্ডের চেয়ে বেশি ভালোবাসি। ইসলামের শত্রুরা যদি তোমাকে ছেড়ে যাওয়ার জন্য আমাকে বাধ্য না করতো তাহলে আমি কখনও তোমাকে ছেড়ে যেতাম না। *(তিরমিযী, ইবন মাযাহ শরীফ)*

২। ফুদালাহ ইবন উবায়দ (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, মৃত্যুর পরে প্রত্যেক মৃত ব্যক্তির আমল নিঃশেষ হয়ে যাবে। তবে যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে দেশের সীমান্ত পাহারা দেয় তার আমল কিয়ামত পর্যন্ত বাড়তে থাকবে এবং সে কবরের আযাব ও পরীক্ষা ক্ষেত্রেও নিরাপদ থাকবে। *(আবু দাউদ, তিরমিযী শরীফ)*

৩। হযরত সালমান (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি মহানবী (সা)-কে বলতে শুনেছি: এক রাত ও একদিন ধরে দেশের সীমান্ত পাহারা দেয়া একমাস যাবত দিনে সিয়াম পালন করা এবং রাতে সালাত আদায় করার চেয়ে বেশি মূল্যবান। এই দায়িত্ব পালনকালে যদি সে মারা যায় তাহলে যে কাজ সে করছিল মৃত্যুর পরেও তা তার জন্য জারি থাকবে এবং জারি থাকবে তার রিযকও। কবরের আযাব ও পরীক্ষা থেকেও সে নিরাপদ থাকবে। *(বুখারী ও মুসলিম শরীফ)*

৪। হযরত উসমান (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-কে আমি বলতে শুনেছি আল্লাহর পথে একদিন দেশের সীমান্ত পাহারা দেয়া হাজার দিন অন্যান্য পাহারা ও ইবাদত-বন্দেগীর চেয়ে শ্রেয়। *(তিরমিযী শরীফ)*

স্বাধীনতার বিকাশ ও জাতির পিতার অবদান

প্রফেসর ড. এ কে এম ইয়াকুব হোসাইন

বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার একটি সমৃদ্ধ রাষ্ট্র। ১৯৭১ সালে সুদীর্ঘ নয় মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশ স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে পৃথিবীর মানচিত্রে স্থান করে নিয়েছে। একটি স্বাধীন ও জাতিভিত্তিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে বাঙালি জাতি প্রাচীনকাল থেকে আগ্রহী ছিল। সেই লক্ষ্যে বাঙালি দীর্ঘকাল ধরে বহু লড়াই-সংগ্রাম চালিয়েছে এবং স্বাধীনতার প্রশ্নে কোনো আপস করতে চায়নি।

স্বাধীন মাতৃভূমির প্রত্যাশায় অনেক বাঙালি এসব আন্দোলন সংগ্রামে জীবন দিয়েছে। অর্থাৎ ১৯৭১ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের বিবর্তন প্রক্রিয়া একটি ঐতিহাসিক এবং অত্যন্ত জটিল পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়েছে। স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রবহমান ধারায় এ এলাকার জনগণের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের পরিবর্তন এসেছে। সেসব পরিবর্তন বাঙালি স্বাধীনতা আন্দোলনকে প্রভাবিত করেছে। দীর্ঘ আন্দোলন এবং অন্যান্য সামাজিক পরিবর্তনের যুগসন্ধিক্ষণে বাংলাদেশের জন্ম হয়েছে।

বাংলাদেশর মুক্তিযুদ্ধ পৃথিবীর ইতিহাসে আলোড়ন সৃষ্টিকারী একটি ঘটনা। পৃথিবীর খুব বেশি দেশ মুক্তিযুদ্ধের ভেতর দিয়ে জন্মলাভের গৌরব অর্জন করতে সক্ষম হয়নি। কিন্তু বাংলাদেশের কৃষক, শ্রমিক, মধ্যবিত্ত, ছাত্র, তরুণসহ আপামর জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে এই যুদ্ধ সাফল্য লাভ করে। যদিও প্রাথমিকভাবে পূর্ব প্রস্তুতি ও সাংগঠনিক তৎপরতা ছাড়াই পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীকে বিভিন্ন পর্যায়ের মানুষ প্রতিরোধ করে। প্রাথমিকভাবে এ প্রতিরোধ ছিল সংগঠিত এবং স্থানীয় নেতৃত্ব নির্ভর আধুনিক সমরাস্ত্রে সজ্জিত প্রবল শত্রু বাহিনীর বিরুদ্ধে অসম লড়াই। পরবর্তীতে বাঙালি সেনা, পুলিশ, ইপিআর এবং আনসার বাহিনীর নিয়মিত ও অনিয়মিত মুক্তিবাহিনীর সমন্বয়ে যুদ্ধকে পরিকল্পিত রূপ দেওয়ার জন্য গঠিত হয় সেক্টর ও ব্রিগেড। দেশের বিভিন্ন এলাকাকে এগারোটি সেক্টরে বিভক্ত করে আনুষ্ঠানিক যুদ্ধ পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয় সেক্টর কমান্ডারদের হাতে। এছাড়া স্থানীয় ভিত্তিতে গড়ে ওঠা বিভিন্ন আঞ্চলিক বাহিনী মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেয়। এসব সশস্ত্রবাহিনী ও যুক্তিযোদ্ধারা বিভিন্ন রণাঙ্গনে পাক হানাদারদের পরাজিত করে। অবশেষে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী মুক্তিবাহিনীর নিকট আত্মসমর্পণ করে। বৃহৎ শক্তির পরাজয় এবং মুক্তিকামী জনতার বিজয় হয়। এভাবে পাক বাহিনীর বিরুদ্ধে পরিচালিত বেসামরিক জনতা ও যৌথ বাহিনীর সদস্যদের প্রতিরোধ যুদ্ধ সফলতা লাভ করে। বিশ্বের মানচিত্রে বাংলাদেশ স্বাধীন সার্বভৌম দেশের মর্যাদা পায়।

বাংলাদেশের অভ্যুদয় এবং বঙ্গবন্ধু

শেরেবাংলা এ. কে. ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী এবং জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এই চার মহান নেতা বাঙালির রাজনৈতিক ইতিহাসে অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবেন। এঁদের মধ্যে প্রথমোক্ত তিনজন জাতীয় দুর্দিনে বাঙালিকে দিক নির্দেশনা দিয়েছেন আর বঙ্গবন্ধুর বলিষ্ঠ নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বাঙালির স্বাধীন স্বদেশ বাংলাদেশ। বঙ্গবন্ধু ১৯৬৬ সনে ছয় দফা ঘোষণার মাধ্যমেই

প্রকৃত প্রস্তাবে বাংলাদেশে স্বাধীনতার বীজ বপন করেন যা ক্রমান্বয়ে সংগ্রামের মধ্যদিয়ে বিকশিত হয়ে জন্ম দেয় স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের। আর এই ধাত্রীরূপী সংগ্রামের সংগঠক ও পরিচালনকারীর কৃতিত্ব কেবলই বঙ্গবন্ধুর। তাই তিনি বাঙালি জাতির জনক।

১৯৬৫ সালে ভারতের সঙ্গে ১৭ দিনের সশস্ত্র সংগ্রামে পাকিস্তান পরাজিত হলে অসম্মানজনক তাসখন্দ যুদ্ধবিরতি চুক্তি মেনে নিতে বাধ্য হয়। পাকিস্তানের পরাজয়, অপমান খুলে ছিল পশ্চিম পাকিস্তানে জুলফিকার আলী ভূট্টোর উত্থানের পথ। পূর্ব পাকিস্তানে শেখ মুজিব, দলমনা কয়েকজন অর্থনীতিবিদ ও কয়েকজন সরকারি আমলার পরামর্শক্রমে তাঁর ছয় দফা দাবিনামা প্রস্তুত করলেন, যার লক্ষ্য ছিল পূর্ব পাকিস্তানে সম্পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠা। এই কর্মসূচি অচিরেই পূর্ব পাকিস্তানে অসম্ভব জনপ্রিয়তা অর্জন করল। কারণ পশ্চিমের অর্থনৈতিক নিপীড়নের চাপে পিষ্ট ছিল পূর্ব পাকিস্তান। পাকিস্তানের দুই খণ্ডের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্য বেড়ে চলেছিল প্রতিবছর এবং সেই সঙ্গে সমতা ও ন্যায়ভিত্তিক সংস্কারের দাবি প্রবল থেকে প্রবলতর হয়ে উঠছিল প্রতিদিন। এতে কেন্দ্রীয় সরকার মনে মনে প্রমাদ গুণল।

১৯৬৬ সালে তিনি তাঁর বিখ্যাত ছয়দফা কর্মসূচী ঘোষণা করেন এবং এই ছয় দফাকে আখ্যায়িত করেন ‘আমাদের (বাঙালিদের) মুক্তি সনদ’ রূপে। দফাগুলো হলো : ১. ফেডারেল রাষ্ট্র গঠন এবং সার্বজনীন প্রাপ্ত বয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে সংসদীয় পদ্ধতির সরকার প্রবর্তন; ২. প্রতিরক্ষা ও পররাষ্ট্র ব্যতীত অপর সকল বিষয় ফেডারেটিং ইউনিট বা প্রাদেশিক সরকারগুলির হাতে ন্যস্ত করা; ৩. দুই রাষ্ট্রের জন্য পৃথক মুদ্রা চালু করা অথবা পূর্ব পাকিস্তান থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে মূলধন পাচার রোধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ; ৪. করারোপের সকল ক্ষমতা ফেডারেটিং রাষ্ট্রগুলির হাতে ন্যস্ত করা; ৫. আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রসমূহকে স্বাধীনতা প্রদান; ৬. রাষ্ট্রসমূহকে নিজের নিরাপত্তার জন্য মিলিশিয়া বা আধা সামরিক বাহিনী গঠনের ক্ষমতা প্রদান করা। সংক্ষেপে এ কর্মসূচীর মধ্য দিয়ে রাজনীতির প্রতি তাঁর এক নূতন দৃষ্টিভঙ্গী উন্মোচিত হয়। প্রকৃতপক্ষে ছয়-দফা কর্মসূচীর অর্থ ছিল কার্যত পূর্ব পাকিস্তানের জন্য স্বাধীনতা। সকল রাজনৈতিক দলের রক্ষণশীল সদস্যরা এ কর্মসূচীকে আতঙ্কের চোখে দেখলেও এটা তরুণ প্রজন্ম বিশেষত ছাত্র, যুবক এবং শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে নূতন জাগরণের সৃষ্টি করে।

মুজিব কর্তৃক ছয়দফা কর্মসূচীর চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেওয়ার পর আইয়ুব সরকার তাঁকে কারারুদ্ধ করে। শেখ মুজিব এবং আরও চৌত্রিশ জনের

বিরুদ্ধে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা নামে একটি রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলা দায়ের করা হয়। সরকারিভাবে এ মামলাটির নাম দেয়া হয় 'রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবুর রহমান এবং অন্যান্য'। মামলায় অভিযুক্তদের অধিকাংশই ছিলেন পাকিস্তান বিমান এবং নৌবাহিনীর বাঙালি অফিসার এবং কর্মচারী। এদের মধ্যে তিনজন ছিলেন উর্দ্ধতন বাঙালি বেসামরিক কর্মকর্তা। মুজিব ইতোমধ্যে কারারুদ্ধ থাকায় তাঁকে এক নম্বর আসামী হিসেবে গ্রেফতার দেখানো হয়। এ মামলায় শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয় যে, তিনি অন্যান্য আসামীর যোগসাজশে পাকিস্তান রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন। অভিযোগ মতে শেখ মুজিবুর রহমান এবং অন্যান্য আসামী ভারতের সহায়তায় পূর্ব পাকিস্তানকে বলপূর্বক বিচ্ছিন্ন করার গোপন পরিকল্পনা করছিলেন। পাল্টা আঘাত হানার এ চালটি অবশ্য বুমেরাং হয়েছিল। ঢাকা কুর্মিটোলা ক্যান্টনমেন্টে একটি বিশেষ ট্রাইব্যুনালে মামলাটির বিচার চলছিল যেটা পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি পাকিস্তানের আধিপত্যবাদী মনোভাবের বিরুদ্ধে বাঙালিদের আবেগ অনুভূতিকে প্রবলভাবে আলোড়িত করে। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার বিচারের সময় মুজিবের জনমোহিনী রূপ আরোও বিকশিত হয় এবং সমগ্র জাতি তাদের নেতার বিচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। ১৯৬৯ সালের প্রথমদিকে বিশেষত তরুণ প্রজন্মের দ্বারা সংগঠিত গণআন্দোলন এমন এক পর্যায়ে পৌঁছে যে আইয়ুব সরকার দেশে আসন্ন একটি গৃহযুদ্ধ এড়ানোর চেষ্টায় মামলাটি প্রত্যাহার করে নেয়। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার বিচারক জাস্টিস রহমান বাংলা একাডেমীর পাশে STATE GUEST HOUSE-এর লাল দালানের পেছনের দরজা থেকে পালিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানে চলে যান। শেখ মুজিব ১৯৬৯ সালের ২২ ফেব্রুয়ারী নিঃশর্ত মুক্তিলাভ করেন।

শেখ মুজিবের মুক্তির পরবর্তী দিন সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ রমনা রেসকোর্সে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) শেখ মুজিবের সম্মানে গণসম্বর্ধনার আয়োজন করে। এ সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদই শেখ মুজিবকে নিঃশর্ত মুক্তি প্রদানে সরকারকে বাধ্য করার ব্যাপারে সবচাইতে কার্যকর রাজনৈতিক এবং সামাজিক শক্তি বলে প্রমাণিত হয়। সংগ্রাম পরিষদের পক্ষ থেকে পরিষদের সভাপতি তোফায়েল আহমদ শেখ মুজিবকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করেন। 'বঙ্গবন্ধু' কোন নাম নয়, অভিধা। অভিধা এমনিতে পাওয়া যায় না; বাবা-মা কিংবা ন্যায়ালয়ের কাছ থেকেও নয়। এটি অর্জিত। অর্জিত হয় মালিন্যময় খিন্ন দৈনিক জীবনেরই ঐশ্বর্যময় আলোকসম্পাতের মাধ্যমে। অর্জিত হয় অভিধা আর হারিয়ে যায় নাম। মহাত্মা গান্ধীর পেছনে লুকিয়ে পড়ে তখন মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী, আর নেতাজী বললেই বুঝতে পারি

সুভাষ চন্দ্র বসুকে। চিত্তরঞ্জন দাস অন্ধকারে তলিয়ে যান দেশবন্ধুর আড়ালে। বিদ্যাসাগরের নাম যে ঈশ্বরচন্দ্র শর্মা একথাও ভুলে যাই। মনে রাখি শেরে-বাংলাকে, আবুল কাশেম ফজলুল হককে মনে রাখবার প্রয়োজনই পড়ে না আমাদের। এভাবেই অভিধান আলোকিত ঝর্ণাধারার সরব প্রপাতে হারিয়ে যায় নাম, থাকে শুধু অভিধা, উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের মতন।

বঙ্গবন্ধু ছিলেন একটি মহাকাব্যের মহাকবি, মহানায়ক। আর এই মহাকাব্য জাতীয়তাবাদের। আরো নির্দিষ্টার্থে এ হচ্ছে পাকিস্তানী রাষ্ট্র কাঠামোর অধীনে বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের অভ্যুত্থান ও পরিণতিতে নতুন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা।

মুজিবের মধ্যে তারা এমন একজন ত্যাগী নেতার প্রতিফলন দেখতে পান যিনি ২৩ বছরের পাকিস্তানি শাসনামলের প্রায় বারো বছর জেলে কাটিয়েছেন। বারো বছর জেলে এবং দশ বছর কড়া নজরদারীতে থাকার কারণে শেখ মুজিবের কাছে পাকিস্তানকে নিজের স্বাধীন বাসভূমির পরিবর্তে এবং কারাগার বলেই মনে হতো।

১৯৭০ সালে ডিসেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত পাকিস্তানের প্রথম সাধারণ নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের একমাত্র মুখপাত্র হিসেবে আবির্ভূত হন। তাঁর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ পাকিস্তান জাতীয় পরিষদে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য বরাদ্দ ১৬৯ টি আসনের ১৬৭ টি আসনে (মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত সাতটি আসন সহ) জয়লাভ করে।

আপামর জনগণ তাঁকে ছয়দফা মতবাদের পক্ষে নিরঙ্কুশ ম্যান্ডেট প্রদান করে। ছয় দফা বাস্তবায়নের দায়িত্ব তাঁর উপরই বর্তায়। ১৯৭১ সালের ৩ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পূর্ব পাকিস্তানের সব প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে রমনা রেসকোর্সে একটি ভাবগম্ভীর অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন এবং শপথ নেন যে, পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র প্রণয়নের সময় তারা কখনও ছয়দফা থেকে বিচ্যুত হবেন না।

স্বাধীনতা হল জন্মগত অধিকার। এটা অমুসলমান-মুসলমান সবারই অধিকার। ফরাসী বিপ্লবের সময় প্রখ্যাত ফরাসী দার্শনিক, রাষ্ট্র বিজ্ঞানী রুশো তার 'দি সোস্যাল কনট্রাক্ট' গ্রন্থে লেখেন, 'ম্যান ইজ বর্ন ফ্রি, এন্ড এভরি হোয়ার হি ইজ ইন আয়রনস' (মানুষ জন্মগতভাবে স্বাধীন, কিন্তু সে সর্বত্র শৃঙ্খলাবদ্ধ)।

৭ মার্চে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ এবং পরবর্তী ঘটনাসমূহ

পাকিস্তান সেনাশাসকদের দমন ও হত্যা নীতি যখন আরও বাড়তে থাকে এবং নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের সিদ্ধান্ত না গ্রহণ করার পটভূমিতে ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধু ঢাকা রেসকোর্সে ময়দানে বাঙালি জাতির প্রতি দিকনির্দেশনামূলক ভাষণে তাঁর নির্দেশ প্রদান করেন। এই ভাষণে তিনি জাতিকে নির্দেশ দেন, "আমি যদি হুকুম দেবার নাও পারি, তোমাদের কাছে আমার অনুরোধ রইল, ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল। ... এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম।" বঙ্গবন্ধুর এই ভাষণ বিশ্বের নেতৃবৃন্দের ভাষণগুলোর মধ্যে অন্যতম হিসেবে বিবেচিত হয়।

১৯৭১-এর ২৩ মার্চ পল্টন ময়দানে জয় বাংলা বাহিনীর কুচকাওয়াজের পরে ধামণ্ডির ৩২ নম্বর সড়কে বঙ্গবন্ধু ভবনে আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করেন। সেদিন পূর্ব বাংলার প্রতিটি শহরে পাকিস্তান দিবসের অনুষ্ঠান বর্জন এবং পাকিস্তানের পতাকার পরিবর্তে বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করা হয়।

এ-সময়টাতে জুলফিকার আলী ভুট্টো একের পর এক দূরভিসন্ধিমূলক দাবি উপস্থাপন করে রাজনৈতিক সমাধানের পথ রুদ্ধ করার প্রচেষ্টা চালায় এবং কালক্ষেপণ করতে থাকে। পূর্ব বাংলায় তখন মাত্র এক ডিভিশন সৈন্যবাহিনী ছিল। এরপর মাত্র ২০ দিনে গোপনে আরও দুই ডিভিশন সৈন্য পূর্ব বাংলায় স্থানান্তর করা হয়। আলোচনার প্রহসনের অন্তরালে বিশাল সেনাবাহিনী প্রস্তুত করা হয় বাঙালিদের উপরে আক্রমণ করার জন্য। এই হত্যাযজ্ঞের নির্দেশনার পরিচয় ছিল (অপারেশন সার্চলাইট)।

বাংলাদেশে গণহত্যা ও মুক্তিযুদ্ধ শুরু

২৫ মার্চের কালোরাতে পাকিস্তান সেনাবাহিনী অতর্কিত আক্রমণের প্রস্তুতি নিয়ে ঢাকাসহ দেশের সকল বড় শহর, সেনানিবাসের বাঙালি রেজিমেন্টসমূহ এবং গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলোতে আক্রমণ করে এবং এর ফলে সংঘটিত হয় মর্মান্তিক হত্যাযজ্ঞ। বঙ্গবন্ধু ২৬ মার্চ রাতে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করে চূড়ান্ত জয়লাভ না করা পর্যন্ত জনগণকে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেন। পাকিস্তান সেনাবাহিনী তাকে গ্রেফতার করে পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে যান। বন্দি হওয়ার আগে তিনি দলীয় নেতৃবৃন্দকে পরবর্তী করণীয় বিষয়ে যথাযথ নির্দেশ প্রদান করেন।

১৯৭১-এর ১০ এপ্রিল তেলিয়াপাড়া চা-বাগানের ডাকবাংলোয় বঙ্গবন্ধুর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নির্বাচিত সংসদ সদস্যগণ সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে স্বাধীন সর্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার গঠন করে। এই সরকারের কার্যকারিতা

সাংবিধানিকভাবে স্বীকৃত হয় স্বাধীনতার সনদ হিসেবে। নির্বাচিত সরকারের নিয়ন্ত্রণে একটি পরিকল্পিত যুদ্ধ পরিচালনার জন্য ১০ এপ্রিল বাংলাদেশেকে ৪টি যুদ্ধ অঞ্চল বা সামরিক অঞ্চলে বিভক্ত করা হয়।

বঙ্গবন্ধুর অবর্তমানে সৈয়দ নজরুল ইসলাম ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি হিসেবে এবং কর্নেল এম.এ.জি. ওসমানী মুক্তিবাহিনীর প্রধান সেনাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন বলে এই অনুষ্ঠানে সরকারি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতিকে আনুষ্ঠানিকভাবে গার্ড অব অনার প্রদান করা হয়। দেশ-বিদেশের অসংখ্য সাংবাদিক ও হাজার হাজার দেশবাসী এই ঐতিহাসিক অনুষ্ঠান প্রত্যক্ষ করেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নামানুসারে বৈদ্যনাথতলার নামকরণ করা হয় 'মুজিবনগর'। এই সরকার দক্ষ হাতে দৃঢ়তার সাথে দীর্ঘ নয় মাসব্যাপী সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করেন। ১৯৭১-এর মে মাসে কোলকাতার ৮নং থিয়েটার রোডে মুজিবনগর সরকারের প্রধান দপ্তর স্থাপন করা হয়।

এছাড়াও স্বতঃস্ফুর্ত প্রাথমিক প্রতিরোধ ও সংগঠিত প্রতিরোধ (মুক্তিফৌজ, মুক্তিবাহিনী, গেরিলা ও সম্মুখ যুদ্ধ)

স্বতঃস্ফুর্ত প্রাথমিক প্রতিরোধ, সংগঠিত প্রতিরোধ, অনিয়মিত বাহিনী (রাজনৈতিক মতাদর্শভিত্তিক বাহিনীঃ মুজিব বাহিনী), মুক্তিযুদ্ধের প্রচার মাধ্যম (স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্র, বিদেশি প্রচার মাধ্যম, জনমত গঠন), ছাত্র, নারী ও সাধারণ মানুষের অবদান (গণযুদ্ধ), দখলদার বাহিনী, শান্তি কমিটি, আলবদর, আলশামস, রাজাকার বাহিনী, রাজনৈতিক দল এবং দেশীয় অন্যান্য সহযোগীদের স্বাধীনতা বিরোধী কর্মকাণ্ড, মুক্তিযুদ্ধের হত্যাকাণ্ড, পাকিস্তানে বন্দি অবস্থায় বঙ্গবন্ধুর বিচার ও বিশ্ব প্রতিক্রিয়া, মুক্তিযুদ্ধের বৃহৎ শক্তিসমূহের ভূমিকা, প্রবাসী বাঙালি ও বিশ্বের বিভিন্ন দেশের নাগরিক সমাজের ভূমিকা, মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে বিদেশে তহবিল সংগ্রহ, মুক্তিযুদ্ধে ভারতের ভূমিকা, মুক্তিযুদ্ধে ভারতের সমর্থন ও সহযোগিতার কারণ, মুক্তিযুদ্ধে সমর্থন ও সহযোগিতায় ভারতের গৃহীত পদক্ষেপসমূহ ও ভারতের শিল্পী, সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীদের অবদান।

৭১ সালে নিরস্ত্র বাঙালীদের নির্মমভাবে হত্যা করে খানসেনারা

এবার পলাশীর ময়দানে ফিরে যাই। পলাশীর ময়দানে হোনলাল ও মীরমর্দান ইংরেজদের বিরুদ্ধে জীবন মরণ যুদ্ধ করেছিল বাংলার স্বাধীনতা রক্ষার জন্য। সেদিন যদি সেনাপতি মীরজাফর তার প্রভু বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যায় শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজউদ্দৌলার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা না করতো তবে বাংলার স্বাধীনতা সূর্য অস্ত যেত না।

এ দেশের মুসলমান হিন্দুরা পাশাপাশি ভাইয়ে ভাইয়ে মিলে মিশে থাকতে পারত। ইংরেজরা এদেশ শাসন ও শোষণ করার জন্য ‘Divide and Rule policy’ দ্বারা হিন্দুদের মুসলমানের বিরুদ্ধে এবং মুসলমানদের হিন্দুদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করেছে।

১৯৭১ সালে শেখ মুজিব ইলেকশনে জিতেও পাকিস্তানের ক্ষমতায় যেতে পারলেন না ভূট্টো ও জেনারেলদের ষড়যন্ত্রের কারণে। পাকিস্তানের জেনারেলরা ছিল ক্ষমতালোভী ও উচ্চভিলাষী। তারা গণতন্ত্রকে কোন সম্মান দিতে জানত না।

‘৭১-এ পাকিস্তানের সর্বমোট ১৯৪ জন আর্মি অফিসার বাংলাদেশে গণহত্যার (genocide) জন্য দায়ী যারা আইনের ভাষায় WAR CRIMINALS ইয়াহিয়া খান, টিক্কা খান ও নিয়াজি এখন পরপারে। কিন্তু বাঙালিরা তাদের কোনদিন ক্ষমা করবে না। কারণ তারা এদেশের নিরীহ বাঙালিদের একাত্তর সালে নির্বিচারে হত্যা করেছে এবং নিরীহ নারীদের ধর্ষণ করেছে।

যারা নিরীহ মানুষদের হত্যা করে এবং অবলা নারীদের ধর্ষণ করে তারা তো মুসলমান নয়, তারা পশুর থেকেও অধম। দখলদার পাক আর্মিরা ইসলাম ও পাকিস্তান রক্ষার জন্য এদেশে গণহত্যা ও ধর্ষণ করে যা ইসলামের আদর্শের পরিপন্থী আমাদের মহানবী (সা) বিদায় হজের ভাষণে আরাফাত ময়দানে বলে গিয়েছেন সারা বিশ্বের মানুষের উদ্দেশ্যে।

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ১৯৭১ সালের ১ মার্চ এক ঘোষণায় ৩ মার্চ ঢাকায় অনুষ্ঠেয় জাতীয় পরিষদের অধিবেশন একতরফাভাবে স্থগিত করেন। এ ঘোষণার ফলে পূর্ব পাকিস্তানে সর্বাত্মক বিক্ষোভের আগুন জ্বলে উঠে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে বঙ্গবন্ধু পূর্ব পাকিস্তানে সর্বাত্মক অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন। সমগ্র প্রদেশ তাঁকে সমর্থন জানায়। অসহযোগ আন্দোলন চলাকালে (২-২৫ মার্চ ১৯৭১) পূর্ব পাকিস্তানের গোটা বেসামরিক প্রশাসন তাঁর নিয়ন্ত্রণে চলে আসে এবং তাঁর নির্দেশমত চলে। তিনি কার্যত অর্থে প্রাদেশের সরকার প্রধান হয়ে যান। লন্ডনে দৈনিক Evening Standard পত্রিকার ভাষায়: ‘জনতার পুরোপুরি সমর্থন পেয়ে শেখ মুজিব যেন পূর্ব পাকিস্তানের কর্তৃত্বে সমাসীন হন। (মুজিবুর) রহমানের ধানমন্ডির যে বাড়ি ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর বাসভাবনের অনুকরণে ইতোমধ্যে ১০ ডাউনিং স্ট্রীটের মতো পরিচিতি লাভ করেছে তা আজ আমলা, রাজনীতিক, ব্যাংকার, শিল্পপতি এবং সমাজের সর্বস্তরের মানুষের দ্বারা অবরুদ্ধ। (১২ মার্চ ১৯৭১)

অপারেশন সার্চলাইটের নামে ২৫ মার্চ মধ্যরাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সহ বিভিন্ন স্থানে পৈশাচিক তাণ্ডব চালিয়ে ছাত্র-শিক্ষক এবং নিরীহ লোকদের গণহারে হত্যা করে। এভাবে পাকিস্তানি দখলদার বাহিনী দীর্ঘ নয় মাস ধরে গণহত্যা চালিয়ে যায়। শেখ মুজিবকে ২৫ মার্চ রাতে গ্রেফতার করে ঢাকা সেনানিবাসে আটক রাখা হয় এবং রাষ্ট্রদ্রোহিতা ও বিদ্রোহে উস্কানি দেওয়ার অভিযোগে বিচারের জন্য পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে যাওয়া হয়। গ্রেফতার হওয়ার পূর্বে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করে তা সম্প্রচারের জন্য ইপিআর ট্রান্সমিটারের মাধ্যমে চট্টগ্রামে এক ওয়্যারলেস বার্তা পাঠান। তাঁর ঘোষণাটি নিম্নরূপঃ "This may be my last message, from today Bangladesh is Independent. I call upon the people of Bangladesh wherever you might be and with whatever you have, to resist the army of occupation to the last. Your fight must go on until the last soldier of Pakistan occupation army is expelled from the soil of Bangladesh. Final victory is ours.

'এটাই হয়তো আমার শেষ বার্তা। আজ হতে বাংলাদেশ স্বাধীন। বাংলাদেশের জনগণের প্রতি আমার আহ্বান, আপনারা যে যেখানেই থাকুন এবং যার যা কিছু আছে তা দিয়ে শেষ পর্যন্ত দখলদার সেনাবাহিনীকে প্রতিহত করুন। বাংলাদেশের মাটি থেকে পাকিস্তান দখলদার বাহিনীর শেষ সৈনিকটি বিতাড়িত এবং চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত আপনাদের এ লড়াই চালিয়ে যেতে হবে।'

যৌথ বাহিনী গঠন ও চূড়ান্ত বিজয়

১৯৭১ সালের ৩ ডিসেম্বর পাকিস্তানি বিমানবাহিনী ভারতীয় বিমান ঘাঁটি অমৃতসর, পাঠানকোট, শ্রীনগর ও আগ্রার ওপর অতর্কিত বিমান হামলা চালালে সেদিনই ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী পাকিস্তারে বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন।

৪ ডিসেম্বর থেকে বাংলাদেশের মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় বাহিনী যৌথভাবে পাক হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করতে থাকে। ১৯৭১ সালের ৬ ডিসেম্বর ভারতের প্রধানমন্ত্রী আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেন। ফলে পাকিস্তান ভারতের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করে।

৭ ডিসেম্বর যৌথ বাহিনীর আক্রমণে যশোর ক্যান্টনমেন্টের পতন ঘটে এবং পাকসেনারা তাদের সাজসরঞ্জাম নিয়ে পালিয়ে যায়। সিলেট শহরটিও ইতোমধ্যে যৌথ বাহিনীর করায়ত্ত হয়। যৌথ বাহিনী এসময় ময়নামতি ক্যান্টনমেন্টের চারদিক অবরোধ করে রাখে। ৯ ডিসেম্বর চারদিক থেকে মিত্রবাহিনী ঢাকার দিকে অগ্রসর হতে থাকে। ১০ ডিসেম্বর ঢাকা থেকে বিদেশিদের সরিয়ে দেওয়ার জন্য বিমান হামলা বন্ধ রাখা হয়। ১১ ডিসেম্বর চতুর্দিকে পাক বাহিনীর প্রতিরোধ

ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ে। সেদিন বাংলাদেশে বহু পাক ঘাঁটির পতন হয়। অবস্থা অত্যন্ত বেগতিক দেখে ড. মালিক তার মন্ত্রিপরিষদসহ পদত্যাগ করেন। ১২ ডিসেম্বর কুষ্টিয়া হানাদার মুক্ত হয়। এদিন তিনটি আন্তর্জাতিক বিমানে করে বিদেশিরা কলকাতায় চলে যায়। ১৩ ডিসেম্বর টাঙ্গাইল মুক্ত হয়। এদিকে ১২ ডিসেম্বর হতে নির্দিষ্ট সময় পর পর ভারতীয় বাহিনী পুনরায় ঢাকা নগরীর ওপর বিমান হামলা চালাতে থাকে এবং ১৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত তা অব্যাহত থাকে। এদিকে মার্কিন সপ্তম নৌবহর ভারত মহাসাগরে অগ্রসর হওয়ার খবরে নিয়াজী তাদের কাছ থেকে সাহায্য প্রাপ্তির আশায় উৎকণ্ঠিত হয়ে ওঠেন। শোনা যায় নিয়াজী মার্কিন দূতাবাসের কাছে এ আশ্বাস পেয়েছিলেন যে, সপ্তম নৌবহর তাকে ও তার লোকজনকে পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে যাবে। গোটা বিশ্বে তখন পূর্ব পাকিস্তানকে ধ্বংস করতে মার্কিন সপ্তম নৌবহরের আগমন নিয়ে জল্পনা কল্পনা চলছে। বিশ্ববিবেক উৎকণ্ঠিত হয়ে ভাবছিল, নিক্সন প্রশাসন কি প্রকৃতপক্ষেই বর্বরতার নায়ক ইয়াহিয়াকে সহায়তা করবে? কিন্তু ডিসেম্বরের ১৩/১৪ তারিখের দিকে নিয়াজীর আশা নৈরাশ্যে পরিণত হয়। ভারতের সাথে মৈত্রীচুক্তির কারণে ইন্দিরা গান্ধীর অনুরোধে রাশিয়া বাংলাদেশের পক্ষে নৌবহর পাঠালে মার্কিন রণতরি নিয়াজীকে সহায়তা প্রদান না করেই ভারত মহাসাগর থেকে ফিরে যায়।

ইতোমধ্যে পাক বাহিনীর অবস্থা ক্রমান্বয়ে শোচনীয় হচ্ছে দেখে ঢাকার কয়েকটি বিদেশি দূতাবাস নিয়াজীকে আত্মসমর্পণের পরামর্শ দেয়। নিয়াজী এবং তার সমরনায়করাও বুঝে ছিলেন তাদের অবস্থা অত্যন্ত বেগতিক। ১৬ ডিসেম্বর সকাল ১০টায় পাকিস্তানি বাহিনীর ১৪ ডিভিশন কমান্ডার মেজর জেনারেল জামশেদ ঢাকার মিরপুর ব্রিজের কাছে ভারতীয় জেনারেল নাগরার নিকট আত্মসমর্পণ করেন। এদিন ১০:৪০ মিনিটে কাদের সিদ্দিকী ও ভারতীয় মিত্রবাহিনী ঢাকা নগরীতে প্রবেশ করে। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বিকেলে পাক হানাদার বাহিনীর ইস্টার্ন কমান্ডার লে. জেনারেল নিয়াজী ৯৩ হাজার সহযোগী সৈন্য ও অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ঢাকার তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে বাংলাদেশ ও ভারতের সম্মিলিত মিত্র ও মুক্তিবাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় প্রধান সেনাপতি লে. জেনারেল জগজিৎ সিং আরোরার কাছে আত্মসমর্পণ করেন। ১৯৭১ এর ২৬ মার্চ থেকে ১৯৭১ এর ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত এ দীর্ঘ নয় মাস রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের পরিসমাপ্তি ঘটে। বিশ্বের বুকে জন্ম নেয় স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র বাংলাদেশ।

আত্মসমর্পণের দলিল

পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলীয় সামরিক কর্তৃপক্ষ পূর্ব রণাঙ্গনে ভারতীয় এবং বাংলাদেশের সশস্ত্রবাহিনীর সর্বাধিনায়ক লেফটেন্যান্ট জেনারেল জগজিৎ সিং আরোরার কাছে বাংলাদেশে পাকিস্তানের সব সশস্ত্রবাহিনীর সদস্য আত্মসমর্পণে

স্বীকৃত হচ্ছেন। এই আত্মসমর্পণ পাকিস্তানের সব সেনা, বিমান ও নৌবাহিনীর এবং আধাসামরিক ও বেসামরিক সশস্ত্রবাহিনীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এসব বাহিনীর সবাই যারা যেখানে আছে, সেখানকার নিকটস্থ লেফটেন্যান্ট জেনারেল জগজিৎ সিং আরোরার কর্তৃত্বাধীন নিয়মিত সেনাবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ ও সব অস্ত্র সমর্পণ করবে। এ দলিল স্বাক্ষরের সময় থেকে পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলীয় সামরিক কর্তৃপক্ষ লেফটেন্যান্ট জেনারেল আরোরার নির্দেশের অধীনস্থ বলে বিবেচিত হবে। কোনো প্রকার অবাধ্যতা আত্মসমর্পণের শর্তভঙ্গ হিসেবে বিবেচিত হবে এবং যুদ্ধের স্বীকৃত ও প্রচলিত রীতি অনুযায়ী ব্যবস্থা গৃহীত হবে। যদি আত্মসমর্পণের কোনো শর্তের ব্যাখ্যা বা অর্থ সম্পর্কে বিতর্ক দেখা দেয় সেক্ষেত্রে লেফটেন্যান্ট জেনারেল আরোরার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।

লেফটেন্যান্ট জেনারেল জগজিৎ সিং আরোরা এ আশ্বাস প্রদান করেছেন যে, আত্মসমর্পণকারী প্রত্যেক ব্যক্তির প্রতি জেনেভা কনভেনশনের শর্ত অনুযায়ী একজন সৈনিকের প্রাপ্য মর্যাদা ও সম্মান প্রদর্শন করা হবে এবং আত্মসমর্পণকারী সব সামরিক ও আধাসামরিক ব্যক্তির নিরাপত্তা ও সুব্যবস্থার অঙ্গীকার প্রদান করেছেন। লেফটেন্যান্ট জেনারেল জগজিৎ সিং আরোরার অধীনস্থ সেনাবাহিনী সব বিদেশি নাগরিক, সংখ্যালঘু জাতিসত্তা ও পশ্চিম পাকিস্তানি ব্যক্তিদের নিরাপত্তা প্রদান করবে।

জগজিৎ সিং আরোরা লেটেন্যান্ট জেনারেল জেনারেল অফিসার কমান্ডিং ইন চিফ ভারত-বাংলাদেশ যৌথ বাহিনীর পূর্ব রণাঙ্গন ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১	আমীর আবদুল্লাহ খান নিয়াজী লেফটেন্যান্ট জেনারেল সামরিক আইন প্রশাসক জোন-বি এবং কমান্ডার পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ড (পাকিস্তান) ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১

১৬ ডিসেম্বর বাংলার সাধারণ মানুষ

১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশের রাজনৈতিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক জীবনে এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হিসেবে বিবেচিত। এদিন বাংলার মানুষ দীর্ঘ নয় মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জন করে। এটি ছিল এক ঐতিহাসিক ঘটনা। এদিনে বাঙালিরা একটি সার্বভৌম রাষ্ট্র গঠনের স্বপ্ন বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হয়। ১৬ ডিসেম্বর স্বাধীনতার স্বপ্ন বাস্তবায়িত হচ্ছে এটি তাৎক্ষণিক বাংলার সাধারণ মানুষ বুঝে উঠতে পারেনি। কিন্তু বাঙালি জনগোষ্ঠীর অধিকাংশ নাগরিক সেদিন বুঝতে সক্ষম হয়েছিল যে, বাংলাদেশ স্বাধীন হতে যাচ্ছে। সেদিন চুক্তি স্বাক্ষরের শেষ বিকেলের মহেন্দ্রক্ষণে সারা বাংলার মানুষ আনন্দের জোয়ারে ভাসতে

লাগলেন। বাংলার আকাশ বাতাস বিদীর্ণ করে স্বাধীনতার লাল সূর্য সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে।

এদিন ঢাকা শহরের চিত্র ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। ঢাকার সোহরাওয়ার্দী উদ্যানকে ঘিরে সারা ঢাকা শহরের মানুষ একত্রিত হয়েছিল। এ উদ্যানে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর কমান্ডারের আত্মসমর্পণের খবর ছড়িয়ে পড়লে শহরের সব মানুষ সেখানে জড়ো হতে থাকে। ঢাকা শহরের সব শ্রেণি পেশার মানুষ রাস্তায় নেমে আসে এবং স্বাধীনতার জয়োল্লাস প্রকাশ করতে থাকে। সময় যত গড়াতে থাকে জনগণের উৎকণ্ঠা ততই বাড়তে থাকে। ধীরে ধীরে জাতি এগিয়ে যায় নতুন দিনের দিকে। অবশেষে বিকাল চারটা একত্রিশ মিনিটে আত্মসমর্পণ দলিলে স্বাক্ষর হলে সব উৎকণ্ঠার অবসান ঘটে।

স্বাধীনতা সংগ্রামে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্ব

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের অবিসংবাদিত নেতা জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তাঁর নেতৃত্বে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধ এবং শেষে স্বাধীনতা অর্জন বিংশ শতাব্দীর এক অবিস্মরণীয় ঘটনা। ছাত্রজীবনে কলকাতা ইসলামিয়া কলেজে অধ্যয়নরত অবস্থায় পাকিস্তান আন্দোলনে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সহযোদ্ধা হিসেবে কাজ করেন। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রারম্ভে রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নে পূর্ব পাকিস্তানের সাথে পশ্চিম পাকিস্তানের দ্বন্দ্ব এবং পরবর্তী ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের নাগপাশ থেকে এদেশের মানুষ মুক্ত হলেও পাকিস্তানি নব্য উপনিবেশের আওতায় এদেশের মানুষ নিপতিত হলো। সেদিক থেকে বলা যায়, জীবনের শুরু থেকে বঙ্গবন্ধু বাংলা এবং বাঙালিদের স্বাধীনসত্তা নিয়ে ভেবেছেন। তাই ব্রিটিশ উপনিবেশ উত্তর পাকিস্তান এবং সেখান থেকে বাংলাদেশ সবক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্ব ঐতিহাসিকভাবে স্বীকৃত।♦

লেখক : সাবেক অধ্যক্ষ, সরকারি মাদরাসা-ই-আলিয়া, ঢাকা

বঙ্গবন্ধু

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি

ড. মাহফুজ পারভেজ

প্রাক্-সাতচল্লিশ সময়কালের অবিভক্ত ব্রিটিশ-বাংলার রাজনীতিতে ও নেতৃত্বের কাঠামোতে সত্যিকার অর্থে কোনও 'সাধারণ' বা 'অভাজন' ব্যক্তির অস্তিত্ব ছিল না। মাওলানা আকরম খাঁ (১৮৬৮-১৯৬৯), দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস (১৮৭০-১৯২৫), শরৎচন্দ্র বসু (১৮৮৯-১৯৫০), হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী (১৮৯২-১৯৬৩), খাজা নাজিমুদ্দীন (১৮৯৪-১৯৬৪), নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু (১৮৯৭-১৯৪৫), শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী (১৯০১-১৯৫৩), আবুল হাশিম (১৯০৫-১৯৭৪) প্রমুখ সকলেই 'অভিজন', 'সম্ভ্রান্ত', 'উচ্চশ্রেণি'ভুক্ত 'এলিট'[১] ঘরানার মানুষ। এমনকি, বৃহৎ বঙ্গের কৃষক-প্রজার অবিসংবাদিত নেতা শেরে বাংলা এ.

কে. ফজলুল হক (১৮৭৩-১৯৬২) পর্যন্ত ব্যতিক্রম নন। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা, পেশা, অতুলনীয় বাগ্মিতা বিচার করলে তিনিও তাঁর সমর্থক-অনুসারী সমাজের বিবেচনায় ছিলেন 'অভিজাত'। মজলুম জননেতা নামে পরিচিত মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী (১৮৮০-১৯৭৬) সাধারণের রাজনীতি করলেও 'সাধারণ' নন, 'অসাধারণ'। কারণ, তিনি একই সঙ্গে ধর্মবেত্তা ও ধর্মীয় নেতা হওয়ার ফলে এক ধরনের বিশিষ্টতায় অভিষিক্ত।[২]

বঙ্গীয় রাজনীতির পূর্বসূরি নেতাদের সঙ্গে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের (১৯২০-১৯৭৫) রাজনৈতিক মতাদর্শিক দিকগুলোর পাশাপাশি আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক অবস্থানগত পার্থক্যও সুস্পষ্ট। কর্ম, চিন্তা ও প্রচেষ্টার দিক থেকেও তিনি সকলের চেয়ে আলাদা, অগ্রসর এবং স্বতন্ত্র। ফলে উপমহাদেশের রাজনৈতিক ধারাবাহিকতায় অনন্য উত্তরাধিকারের অধিকার বহন করলেও বঙ্গবন্ধু অন্যান্যদের চেয়ে তাঁর স্বতন্ত্র ও স্বকীয় আত্মপরিচয়ের বহুমাত্রিক বৈশিষ্ট্যে দীপ্তিমান। তাঁর এই স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের প্রধানতম বিষয় হলো এই যে, বঙ্গবন্ধু যে বাঙালি এবং তিনি যে বাঙালি কৃষকের সন্তান তা নিজে কখনও ভুলেননি এবং কাউকে ভুলতেও দেননি। আত্মপরিচিতির শুদ্ধতম চৈতন্যে তিনি ছিলেন ঋদ্ধতর, যা বাংলাদেশের বাঙালি জনগোষ্ঠীর জাতীয় পরিচিতির প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি রচনা করেছে; বাঙালি কৃষকের আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক দাবি ও স্বীকৃতি আদায়ে সফল হয়েছে। ফলে বাঙালির চির স্বজন ও সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধুর অনড়, অদম্য ও অনমনীয় প্রচেষ্টায় "বাংলাদেশ নামে একটি রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা ঘটে উঠল কোনও উচ্চশিক্ষিত, বিত্তবান, পূর্বপুরুষের ঐতিহ্যিক উত্তরাধিকার প্রসূত সামাজিক প্রতিপত্তি ও প্রভাব-বিকীর্ণ এবং পেশায় লব্ধপ্রতিষ্ঠিত পুরুষের হাত দিয়ে নয়; বরং তুলনামূলকভাবে ন্যূন ও দুর্বল এক মধ্যবিত্ত গ্রামীণ কৃষক সন্তানের দ্বারা।...এর ফলে এ সিদ্ধান্তেই আসতে হয় যে, পূর্ববাংলা–যা এক সময়ে ইস্ট বেঙ্গল (পূর্ববঙ্গ) থেকে ইস্ট পাকিস্তান (পূর্ব-পাকিস্তান) হয়ে বাংলাদেশ নামে রূপান্তরিত হলো–বেঙ্গল রাজনীতি বঙ্গবন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে এমন এক নতুন যুগে প্রবেশ করল যেখানে অভিজন শ্রেণির নেতৃত্বের স্বাভাবিক প্রস্থান সম্পন্ন হয়ে গেছে এবং পুনরাগমনের সম্ভাবনা নেই।"[৩] ফলে বাঙালির পক্ষে "বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দৈহিক লাবণ্যসুষমা ও ব্যক্তিত্বের শালপ্রাংশুতা স্বীকার ও প্রশংসার জন্য কারও মুজিবপন্থী বা মুজিবপ্রেমী হওয়ার প্রয়োজন পড়ে না। নিরপেক্ষ বিচারক্ষমতা ও নির্মোহ দৃষ্টি থাকলে সকলেই তা উপলব্ধি করার কথা।"[৪] বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যে আদি ও অকৃত্রিম বাঙালির প্রতীক, এই ঐতিহাসিক সত্য যাবতীয় প্রশ্ন ও বিতর্কের অতীত।

শুধু বাঙালির প্রতীকই নন, ব্যাপকার্থে বঙ্গবন্ধু বাঙালির রাজনৈতিক পরম্পরার স্তম্ভরূপে ঐক্যেরও প্রতীক এবং সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালির শীর্ষতম উচ্চতায় সমাসীন: "আমি তো তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখলাম, শেখ মুজিব কখনও বাঙালি জাতি ও দেশ সম্পর্কে একটিও বিভেদমূলক কথা বলেননি। যেখানে গেছেন, যেখানে সুযোগ পেয়েছেন, সেখানে বাঙালির ন্যায্য পাওনার কথা বলেছেন। কখনও কোনও কারণে পিছপা হননি। কাউকে ভয়ও করেন নি। কারও কাছে কোনও পারিতোষিক নেননি। বাংলাকে আর বাঙালিকে এমন করে ভালোবাসতে যিনি পারেন, তিনি যদি বঙ্গবন্ধু না হবেন, তবে আর কে হবে।"[৫]

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের আবির্ভাব বাঙালির রাজনৈতিক জীবনে এবং বাংলাদেশের জাতীয় ইতিহাসে নিঃসন্দেহে একটি অনন্য সাধারণ ঘটনা। তাঁর মৃত্যুতেই তিনি নিঃশেষিত নন। বরং বাংলাদেশের রাজনৈতিক প্রবাহে তিনি কিংবদন্তির মতো বিরাজমান। বাঙালিদের ইতিহাসে অনেক প্রজ্ঞাবান, দক্ষতর, সুযোগ্য ও গতিশীল নেতার দেখা পাওয়া গেলেও রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনে, অর্থনৈতিক মুক্তিতে এবং জাতিসত্তা নির্মাণে আর কারও অবদান বঙ্গবন্ধুর মতো এতো বেশি নয়। তিনি কেবল বাঙালির স্বার্থের সঙ্গেই নয়, তাদের স্বপ্নের সঙ্গেও নিজেকে একাত্ম করেছিলেন। তিনি ছিলেন বাঙালি জাতীয়তাবাদের মূর্ত প্রতীক, যা বাংলাদেশ ও বাঙালির স্বাধীনতা অর্জন ও সার্বভৌম পরিচিতি নির্মাণের আন্দোলনের সোপান রচনা করে দিয়েছিল। বস্তুতপক্ষে, "বাংলাদেশ নামে যে একটি রাষ্ট্র হয়েছে, তা মুজিবের জন্যে আমাদের যুগের কিংবদন্তির মর্যাদার পর্যাপ্ত সাক্ষ্য বহন করছে।"[৬]

বাঙালি ও বাঙালির ঐক্যের প্রতীক বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব, রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, নেতৃত্বের দক্ষতা, সাংগঠনিক শক্তি সত্যিকার অর্থেই বাঙালি জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করার মাধ্যমে পাকিস্তানের 'অভ্যন্তরীণ ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণের নাগপাশ'[৭] থেকে মুক্ত করে অধিকার প্রতিষ্ঠায় সমগ্র জাতিকে দীপ্ত শপথে বলীয়ান করে তুলেছিল। "দলীয় ব্যক্তিত্ব থেকে তিনি পরিণত হয়েছিলেন জাতীয় ব্যক্তিত্বে; তিনি এককভাবে বিলীন হয়ে গিয়েছিলেন রাষ্ট্রীয় অস্তিত্বের সঙ্গে। যে ব্যক্তিত্ব চব্বিশ বছরের পাকিস্তানী দুঃশাসনের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে নয়বার কারারুদ্ধ হয়েছেন, জড়িত হয়েছেন এগারটি ফৌজদারি মামলায়, দু'বার ফাঁসির মঞ্চ থেকে ফিরে এসেছেন, সে ব্যক্তি আমাদের জাতীয় ইতিহাসে একজন মহান রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হিসেবে বিবেচিত হবেন, এটাই স্বাভাবিক।"[৮]

রাজনীতিতে বঙ্গবন্ধুর আবির্ভাব হঠাৎ করে হয়নি; দশ-এগার বছর বয়স থেকেই তাঁর রাজনৈতিক জীবনের শুরু। জীবনের শুরু থেকেই তাঁর মধ্যে গড়ে ওঠে নেতৃত্বসুলভ মনোভাব। রাজনৈতিক লক্ষ্য অর্জনের উপায় হিসেবে তিনি

সর্বদাই বেছে নিয়েছেন শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রেখে সম্পূর্ণভাবে আইনসম্মত উপায়ে আন্দোলন চালিয়ে যাবার পথ। হত্যা ও অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতা দখলের নীতিও তিনি কখনও সমর্থন করেননি। বহু ত্যাগ-তিতিক্ষা, সাধনা এবং নানা তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনার মধ্য দিয়েই তাঁর বিশাল রাজনৈতিক জীবন আবর্তিত হয়েছে। ভাষা আন্দোলন থেকে স্বাধীনতা অর্জনের সোপানগুলো কঠিন ও বন্ধুর পথ পাড়ি দিয়ে তিনি অতিক্রম করেছেন। স্বাধীন বাংলাদেশ ও স্বাধীন জাতি হিসেবে যে মর্যাদা বাঙালি পেয়েছে, তা বঙ্গবন্ধুর মোহনীয় নেতৃত্ব ও কঠোর সংগ্রামের মধ্য দিয়ে অর্জিত ফসল। তিনি বাংলার মানুষের ভাগ্য পরিবর্তন করতে চেয়েছেন; ক্ষুধা, দারিদ্র্য থেকে মুক্তি দিতে চেয়েছেন। বাংলার শোষিত বঞ্চিত মানুষকে শোষণের হাত থেকে মুক্তি দিয়ে উন্নত জীবন দিতে চেয়েছেন। "তাঁর জীবনের এত কষ্ট ও ত্যাগের ফসল আজ স্বাধীন বাংলাদেশ।"[৯]

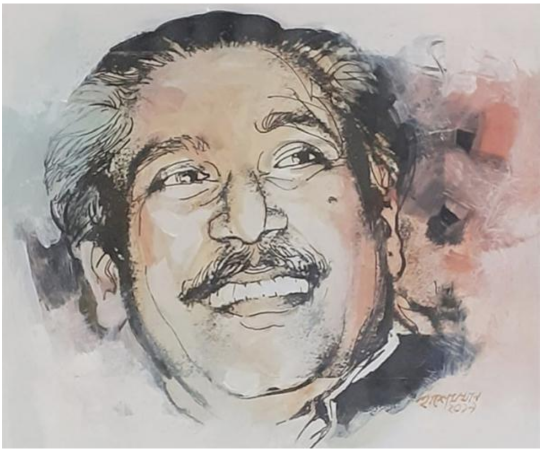

বঙ্গবন্ধু ছিলেন গ্রামীণ সাধারণ পরিবারের সন্তান। তিনি সুযোগ পেয়েছিলেন উদার, অধিকার-বঞ্চিত গ্রামীণ কৃষকের নিরন্তর খণ্ড খণ্ড স্পর্ধিত প্রতিরোধ অবলোকনের, অন্যদিকে তাঁকে ক্রমাগত প্রভাবিত করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ-নজরুল। তাই শহরের গণ্ডি থেকে টেনে তিনি তাঁদের (রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলকে) সমগ্রের প্রতিনিধি করলেন। ঐতিহ্যে স্থির থেকে তিনি বাঙালির আধুনিক পরিচয়কে বহুমাত্রিক পূর্ণতা দিলেন। ভাষা-আন্দোলন যেভাবে বাঙালির নবলব্ধ আত্মপরিচয়কে গণতান্ত্রিক, বহুরৈখিক, সহিষ্ণু করে সামনের দিকে এগিয়ে যাবার পথ বেঁধে দেয় তা থেকে একটুও বিচ্যুত হননি তিনি। বরং হ্যামিলনের বংশীবাদকের মতো ঐ পথেই কোটি বাঙালিকে সঙ্গে নিয়ে হাঁটতে থাকেন স্বাধীনতা তথা মুক্তির মূল লক্ষ্যে পৌঁছানোর প্রতিজ্ঞা বুকে বেঁধে। সার্বিক মুক্তির লক্ষ্যে স্বাধীনতা-আন্দোলনকে পরিচালনা করেই তিনি তাঁর দায়িত্ব শেষ

করেননি। রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে মূলত কৃষক-সন্তানের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত হলো যে বাংলাদেশ তার প্রাথমিক পরিচালনা-দায়িত্ব নিয়েও তিনি ভুলতে পারেননি কৃষকদের কথা। শোষণহীন সমাজ গঠনের তাঁর যে অভিপ্রায় ছিল তা তিনি গোপন করেননি। আর সেই অভিপ্রায়ের জমিনের বড় অংশই জুড়ে ছিল বাংলাদেশের কৃষক। সারা বাংলাদেশের হৃদয়কে এক করার নিরলস প্রচেষ্টায় তিনি কৃষকদের অবস্থান বরাবরই বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে করতেন। বাঙালির ঐতিহাসিক কৃষিভিত্তিক ঐতিহ্যের পরম্পরায় বিকশিত আত্মপরিচয়কে সম্মান ও মর্যাদা প্রদানের পাশাপাশি বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এর রাজনৈতিক স্বীকৃতি ও বিজয় সুনিশ্চিত করেছিলেন বঙ্গবন্ধু।[১০]

ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণের নির্মম অভিজ্ঞতায় জর্জরিত বাঙালি জাতি ও এর মূলস্তম্ভ কৃষক সমাজের মুক্তির জন্য বঙ্গবন্ধু আর্থ-সামাজিক বিভিন্ন ইতিবাচক কর্মসূচি গ্রহণ করেছিলেন। স্বাধীনতা সংগ্রামের সফলতার মাধ্যমে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অভ্যুদয় হলে আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক বিষয়ের মতো ঔপনিবেশিক উত্তরাধিকারের প্রতিনিধি আমলাতন্ত্রেরও সংস্কার এবং পুনর্গঠনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন। “বস্তুতপক্ষে বাংলাদেশের আমলাতন্ত্র উত্তরাধিকারের দিক থেকে ব্রিটিশ-পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক। কাঠামো ও কার্যক্ষেত্রে আমলাতন্ত্রের এই উন্নাসিক মানসিকতা সুস্পষ্ট। স্বাধীনতার প্রাক্কালে আন্দোলনের নেতা শেখ মুজিব ও তাঁর দল ঔপনিবেশিক ধাঁচের আমলাতন্ত্র ও প্রশাসন যন্ত্রের তীব্র সমালোচনায় মুখর ছিলেন। স্বাধীনতার পর শেখ মুজিবের সরকার ক্ষমতায় এসে আমলাতন্ত্রের আগাগোড়া সংস্কার করবার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে নেয়।”[১১]

বঙ্গবন্ধুর বিপুল জনপ্রিয়তা এবং কৃষক তথা বাঙালি জনগোষ্ঠীর পক্ষে নিরঙ্কুশ মতাদর্শিক অবস্থান স্বাধীনতার পর আওয়ামী লীগ সরকারকে আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক নীতি গ্রহণে গণমুখী পদক্ষেপ নিতে প্রণোদিত করে। বঙ্গবন্ধুর শাসন ব্যবস্থার গণচারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের প্রকৃত উপলব্ধি তাঁর সরকারের গৃহীত নীতিমালা ও পদক্ষেপের মূল্যায়নে সুস্পষ্টভাবে উদ্ভাসিত।[১২]

১৯৭২ সালের ২৬ মার্চ মৌলিক নীতি সংক্রান্ত এক ঘোষণায় বঙ্গবন্ধু সমাজতান্ত্রিক আদর্শের প্রতি তাঁর সরকারের অঙ্গীকারের কথা ব্যক্ত করে বলেন: "আমার সরকার অভ্যন্তরীণ সামাজিক বিপ্লবে বিশ্বাস করে। নতুন সমাজ গড়ার জন্যে পুরাতন সমাজ ব্যবস্থা পরিত্যাগ করতে হবে। এটা কোনও নিরর্থক তত্ত্ব কথা নয়। আমার সরকার ও দল বৈজ্ঞানিক সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি কায়েমে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।"[১৩] বস্তুতপক্ষে, ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে দলীয় ঘোষণাপত্র অনুসারে সমাজতন্ত্রকে রাষ্ট্রীয় চার মূলনীতির (গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতা) অন্যতম আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করা হয়। বাংলাদেশের ১৯৭২ সালের সংবিধানে স্পষ্টভাবে ঘোষণা করা হয়েছিল: "জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার মহান আদর্শ–যা আমাদের বীর জনগণকে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে আত্মনিয়োগ ও বীর শহীদদের প্রাণ উৎসর্গ করতে উদ্বুদ্ধ করেছিল–সংবিধানের মূলনীতি হবে।"[১৪]

বাংলাদেশ ও বাঙালি জাতির সংগ্রামশীল ধারাবাহিকতায় স্বাধীন দেশে বঙ্গবন্ধু যে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক নীতিমাল প্রণয়ন করেন, তা ছিল দেশ ও মানুষের স্বার্থের প্রতিচ্ছবি। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তাঁর প্রতিটি পদক্ষেপ বাংলাদেশ ও বাঙালির মর্যাদাকে সমুন্নত করেছে। বঙ্গবন্ধুর সকল কর্ম ও ভাবনার মূলে রয়েছে বাংলাদেশ ও বাঙালি। সেই শৈশব থেকে শুরু করে জীবনের শেষ দিনগুলোতেও তিনি বাঙালি জাতির সকল শ্রেণি ও পেশা তথা কৃষকের কল্যাণ, শ্রমিকের কল্যাণ, সাধারণের মঙ্গল-ভাবনায় ছিলেন সমর্পিতপ্রাণ। রাজনৈতিক নেতা এবং রাষ্ট্রীয় প্রশাসক, উভয় অবস্থানেই সর্বক্ষণ তাঁর পক্ষপাতিত্ব ছিল সাধারণ বাঙালির পক্ষে। তাঁর নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ রাষ্ট্র এবং এর সংবিধানই সেই প্রমাণ বহন করছে। কারণ, "সাধারণ মানুষকে তিনি প্রজাতন্ত্রের মালিক বানাতে চেয়েছেন ওই সংবিধানের মাধ্যমে।"[১৫] স্বাধীনতার মাত্র এক বছর সময়ের মধ্যে তিনি জাতিকে একটি জনমুখী, উত্তম ও প্রগতিশীল সংবিধানই শুধু উপহার দেননি, একটি যুদ্ধবিধ্বস্ত সদ্যোজাত দেশের পুনর্গঠনের মাধ্যমে মানুষের আশা ও আস্থার সফল রূপায়ণ করেছিলেন। বঙ্গবন্ধুর কারণেই সম্ভব হয়েছে, পৃথিবীর ইতিহাসের সবচেয়ে সংক্ষিপ্ততম সময়ের মধ্যে মিত্রবাহিনীর সৈন্যদের স্বদেশে ফিরে যাওয়ার ব্যবস্থা করা। মাত্র ১৮ মাসের মাথায় প্রাপ্তবয়স্কদের সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে দেশে একটি সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্পন্ন করেছেন তিনি, যা বিশ্বের গণতান্ত্রিক ইতিহাসে বিরল দৃষ্টান্ত। অর্থনৈতিক সাম্যের লক্ষ্য অর্জনের অভিপ্রায়ে স্বল্পসময়ের ব্যবধানে একটি 'পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা'ও বাঙালি জাতিকে উপহার দিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু।[১৬]

অথচ দক্ষিণ এশিয়ার রাজনৈতিক ঐতিহ্য ছিল ভিন্ন। এ অঞ্চলের ঐতিহাসিক ধারায় বিনা নির্বাচন ও বিনা সংবিধানে ক্ষমতা আঁকড়ে থাকার প্রবণতাই স্পষ্ট। পাকিস্তানের আমলে সংবিধান রচনার জন্য পাকা নয় বছর সময় কুশাসনের মাধ্যমে অপচয় করা হয়েছিল। ভারতও তার স্বাধীনতার তিন বছরের আগে সংবিধান রচনা করতে পারেনি। উপমহাদেশের এহেন অগণতান্ত্রিক রাজনৈতিক সংস্কৃতির বিপরীতে বঙ্গবন্ধু এক উজ্জ্বলতম ব্যতিক্রম। পাকিস্তানি শাসন-শোষণের রাজনৈতিক প্রতিবাদ করে তিনি যেমন বিজয়ী হয়েছেন, তেমনি পাকিস্তান রাষ্ট্রের অগণতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থার[১৭] উত্তরাধিকারকে ছিন্ন করে বাংলাদেশে গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো বিনির্মাণে সচেষ্ট হয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধুর দূরদৃষ্টিসম্পন্ন নেতৃত্বে যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশে স্বল্পতম সময়ে সংবিধান রচনা, নির্বাচন অনুষ্ঠান ও জনগণের অধিকারের আইনগত স্বীকৃতি নিশ্চিত হয়েছিল।[১৮]

যুদ্ধ বিধ্বস্ত বাংলাদেশের পুনর্গঠন ও গণতন্ত্রায়নের পাশাপাশি বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র, দেশের মধ্যে অবকাঠামো ও সম্পদের অভাব, আমলাতান্ত্রিক অসহযোগিতার বিরুদ্ধে প্রতিনিয়ত লড়াই করেছেন। একমাত্র তাঁরই কারণে নব্য-স্বাধীন বাংলাদেশ স্বাধীনতার পর পরই ১৪২টি রাষ্ট্রের স্বীকৃতি লাভ করেছিল। বাংলাদেশ জোট-নিরপেক্ষ আন্দোলন, জাতিসংঘ, কমনওয়েলথ এবং ওআইসি'র সদস্য পদ পেয়েছিল বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে। বঙ্গবন্ধুর সকল অবদানই বাংলাদেশকে মহীয়ান এবং বাঙালি জাতিকে মর্যাদাবান করেছে। বাঙালির স্বার্থ ও ঐক্যের প্রতীক রূপে বঙ্গবন্ধু সংবিধানে গণতন্ত্র ও সাম্যের অধিকার প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকারকে মূর্ত করেছিলেন 'প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা' প্রণয়নের মাধ্যমে, যাতে বাঙালির সুদূরপ্রসারী উন্নয়নের মূলমন্ত্র নিহিত ছিল। বাঙালি কৃষক ও কৃষির উন্নতির অগ্রাধিকারকে তিনি রাষ্ট্রীয় নীতিমালায় গুরুত্বের সঙ্গে সংযোজিত করেছিলেন। তিনিই প্রথমবারের মতো ১৯৭৩ সালেই কৃষি-স্নাতকদের প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তা করার নির্দেশ জারি করেন এবং বাংলাদেশকে খাদ্য ও কৃষিতে স্বয়ম্ভর করার পথ

দেখান, যাতে ছিল বাঙালি জাতির কৃষক শ্রেণি ও কৃষি সভ্যতার বিকাশের বীজমন্ত্র। এমন কার্যক্রম সফল হয়েছিল বঙ্গবন্ধুর মোহনীয় ও গণমুখী নেতৃত্বের কারণে।[১৯]

জীবনব্যাপী বাঙালির স্বার্থের পক্ষে সংগ্রাম ও কারাভোগের মাধ্যমে সফলতার স্বর্ণালী শিখরে আরোহণের ধারাবাহিকতায় গৌরবদীপ্ত জীবন ও কর্মের অধিকারী বঙ্গবন্ধু তাঁর স্বপ্ন ও পরিকল্পনার কথা লিপিবদ্ধ করেছিলেন *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*তে, যাকে বলা যায়, বাঙালি জাতিসত্তার বিকাশ ও উত্থানের ঐতিহাসিক দলিল। তাঁর রচিত অপর গ্রন্থ *কারাগারের রোজনামচা* হলো বাংলাদেশের মাটি ও বাঙালি মানবগোষ্ঠীর প্রতি ভালোবাসার অনবদ্য উপাখ্যান। *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*তে গত শতাব্দীর চল্লিশের দশকের শুরু থেকে পঞ্চাশ দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত সময়কালের চিন্তা ও কার্যক্রম লিপিবদ্ধ হয়েছে। ঐ সময়কাল ছিল সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্পে জর্জরিত। হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কের চরম অবনতির প্রেক্ষাপটে ভারত ও বাংলা ভাগের রক্তাক্ত অধ্যায় দেখে তিনি হানাহানিকে তীব্র ঘৃণা জানিয়ে অসাম্প্রদায়িক মতাদর্শ গ্রহণ করেন। তিনি স্পষ্টতই উল্লেখ করেছেন যে:

> "আমাদের বাঙালির মধ্যে দুইটা দিক আছে। একটা হলো আমরা মুসলমান, আর একটা হলো আমরা বাঙালি। পরশ্রীকাতরতা এবং বিশ্বাসঘাতকতা আমাদের রক্তের মধ্যে রয়েছে। বোধহয় দুনিয়ার কোনো ভাষায়ই একথাটা পাওয়া যাবে না, পরশ্রীকাতরতা। পরের শ্রী দেখে যে কাতর হয়, তাকে পরশ্রীকাতর বলে। ঈর্ষা, দ্বেষ সকল ভাষায়ই পাবেন, সকল জাতির মধ্যেই কিছু কিছু আছে, কিন্তু বাঙালিদের মধ্যে আছে পরশ্রীকাতরতা। ভাই, ভাইয়ের উন্নতি হলে খুশি হয় না। এই জন্যই বাঙালি জাতির সকল রকম গুণ থাকা সত্ত্বেও জীবনভর অন্যের অত্যাচার সহ্য করতে হয়েছে। সুজলা, সুফলা বাংলাদেশ সম্পদে ভর্তি। এমন উর্বর জমি দুনিয়ায় খুব অল্প দেশেই আছে। তবুও এরা গরিব। কারণ, যুগ যুগ ধরে এরা শোষিত হয়েছে নিজের দেশে। নিজেকে এরা চেনে না, আর যতদিন চিনবে না এবং বুঝবে না ততদিন এদের মুক্তি আসবে না।"[২০]

বাঙালির চরিত্র বিশ্লেষণে সুগভীর দৃষ্টিভঙ্গি বঙ্গবন্ধুকে বাঙালি জাতির আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক ক্ষেত্রে চূড়ান্ত বিকাশের ধারায় নেতৃত্ব দিতে ও নিয়ন্ত্রণ করতে সফল করেছে। জাতীয় চরিত্রের সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করার জন্য তিনি স্বার্থান্ধ, ক্ষমতালিপ্সু, উপরতলার এলিট শ্রেণিকে এড়িয়ে সাধারণ জনতার কাছে চলে গিয়েছিলেন। তাঁদের স্বার্থ ও অধিকার, যা এই জাতিরই পরশ্রীকাতর অংশ

নস্যাৎ করেছিল, তা সংরক্ষণ ও প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট হয়েছিলেন। হিংসা ও সাম্প্রদায়িক হানাহানির মাধ্যমে বাঙালি জাতিকে ঐতিহাসিকভাবে বারবার রক্তাক্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত করার হীন প্রচেষ্টারও মূলোৎপাটন করেছিলেন বঙ্গবন্ধু। তাঁর রাজনৈতিক দর্শন ও কর্মপ্রচেষ্টার যে আলোকদীপ্ত বিস্তৃতি, তার মর্মবাণী লিপিবদ্ধ রয়েছে বঙ্গবন্ধুর *অসমাপ্ত আত্ম*জীবনীতে।

কারাগারের রোজনামচা বঙ্গবন্ধুর জেলজীবনের স্মৃতিকথা, বাঙালির অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের নেতা হিসেবে যে কারাগারে তিনি জীবনের প্রধান অংশই যাপন করেছেন। *কারাগারের রোজনামচায়* বঙ্গবন্ধুর গভীর মননশীলতা ও মানবিকতার দিকগুলো উদ্ভাসিত হয়েছে। গ্রন্থের ভূমিকায় বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা উল্লেখ করেছেন:

> "বিনা বিচারেই তাঁকে একাকী কারাগারে বন্দি করে রেখেছিল। তাঁর অপরাধ ছিল তিনি বাংলার মানুষের অধিকারের কথা বারবার বলেছেন। বাংলার মানুষের ভাগ্য পরিবর্তন করতে চেয়েছেন; ক্ষুধা, দারিদ্র্য থেকে মুক্তি দিতে চেয়েছেন। বাংলার শোষিত বঞ্চিত মানুষকে শোষণের হাত থেকে মুক্তি দিয়ে উন্নত জীবন দিতে চেয়েছেন। গাছপালা, পশু-পাখি, জেলখানায় যারা অবাধে বিচরণ করতে পারত তারাই ছিল একমাত্র সাথি। এক জোড়া হলুদ পাখির কথা কী সুন্দরভাবে তাঁর লেখনীতে ফুটে উঠেছে তা আমি ভাষায় বর্ণনা করতে পারব না। একটা মুরগি পালতেন, সেই মুরগিটা সম্পর্কে চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন। ঐ মুরগিটার মৃত্যু তাঁকে কতটা ব্যথিত করেছে সেটাও তুলে ধরেছেন অতি চমৎকারভাবে। কারাগারে আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীদের দুঃখ দুর্দশা নিয়ে তাঁর উদ্বেগ–দলের প্রতিটি সদস্যকে তিনি কতটা ভালোবাসতেন, তাদের কল্যাণে কত চিন্তিত থাকতেন সেকথাও অকাতরে বলেছেন। তিনি নিজের কষ্টের কথা সেখানে বলেন নাই।"[২১]

বাঙালি জাতির কল্যাণে নিজের ব্যক্তিগত সুখ উৎসর্গ করার এবং কঠোর ত্যাগের অনুপম নিদর্শন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। টুঙ্গিপাড়ার প্রত্যন্ত গ্রামে জন্ম নিয়ে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি.এ. ডিগ্রি লাভ করেন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন বিভাগে অধ্যয়ন করেন। ছাত্র ও যুব নেতা হিসেবে অগ্রণী বঙ্গবন্ধু ১৯৪৯ সালে প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক দল আওয়ামী মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম। বাঙালির বাঁচার দাবি ৬-দফার আন্দোলনের তিনি মধ্যমণি। বঙ্গবন্ধু তাঁর ৬-দফা দাবির সমর্থনে বলেন:

> "পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে বৈষম্য ক্রমাগত আশঙ্কাজনকভাবে বেড়ে যাচ্ছে। পূর্ব পাকিস্তানের সামগ্রিক অর্থনীতি আজ ধ্বংসের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। এই ধ্বংসের হাত থেকে আঞ্চলিক অর্থনীতিকে বাঁচানোর জন্য আঞ্চলিক সরকারকে জরুরি ভিত্তিতে কাজ করার এবং অর্থনীতি পরিচালনার ক্ষমতা দিয়ে পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন দিতে হবে।"[২২]

বঙ্গবন্ধু তাঁর দল আওয়ামীলীগকে ১৯৭০ সালের জাতীয় ও প্রাদেশিক নির্বাচনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে বিজয়ী করেন। ৩১৩ আসন বিশিষ্ট পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের ১৩টি আসন ছিল মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত। ১৯৭০ সালের জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে মোট ৩১৩টি আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ লাভ করে ১৬৭টি আসন, পাকিস্তান পিপলস পার্টি (পিপিপি) ৮৮টি আসন ও অন্যান্য দল ৫৮টি আসন লাভ করে। প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ৩১০টি আসনের মধ্যে ২৯৮টিতেই জয়লাভ করে। বঙ্গবন্ধু একাই ৪টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে সব ক'টিতেই বিপুল ভোটের ব্যবধানে জয়লাভ করেন।[২৩]

বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক ও নির্বাচনী বিজয় ছিল বাঙালি জাতির বিজয়ের নামান্তর, যে অর্জন স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের অন্যতম প্রেক্ষাপট রচনা করে। ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ এক ঐতিহাসিক ভাষণে,[২৪] যা ২০১৭ সালের ৩০ অক্টোবর ইউনেস্কো 'বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ প্রামাণ্য ঐতিহাসিক হিসেবে' স্বীকৃতি দিয়েছে, বঙ্গবন্ধু অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দিয়ে ঘোষণা করেন: "এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।" ঐ সংগ্রামের জন্য তিনি জনগণকে "যা কিছু আছে তাই নিয়ে" প্রস্তুত থাকতে বলেন। রাজনৈতিক সংগ্রামের ধারাবাহিকতায় বঙ্গবন্ধু ২৬শে মার্চ স্বাধীনতার ঘোষণা দেন এবং পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী তাঁকে গ্রেফতার করে। কিন্তু বঙ্গবন্ধুর আদর্শে উজ্জীবিত, নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিরা ১০ই এপ্রিল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত করে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার গঠন করেন। তাঁরা স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র জারি করেন এবং বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে মুক্তিযুদ্ধ

পরিচালনা করেন। ১৬ই ডিসেম্বর বিজয় অর্জন হলে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে ১০ই জানুয়ারি বীরের বেশে মুক্ত, স্বাধীন, স্বদেশ বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। বাঙালির অবিসংবাদিত নেতা হিসেবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জীবদ্দশায় কিংবদন্তি হয়ে ওঠেন।

১৯৭২ সালে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী ও ১৯৭৫ সালে রাষ্ট্রপতির আসনে অধিষ্ঠিত হন। ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট বাংলাদেশের স্থপতি, বাঙালির আশা ও ঐক্যের প্রতীক, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতাবিরোধী কতিপয় সেনাসদস্য কর্তৃক সপরিবারে মর্মান্তিকভাবে নিহত হন। তবে, "তাঁর মৃত্যু ছিল মহিমান্বিত। অত্যন্ত দুঃখবহ ও করুণ মৃত্যুবরণ করতে হলেও তিনি উপহার দিয়ে গেছেন স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ",[২৫] বাঙালি জাতিকে দিয়েছেন মুক্তি ও মর্যাদা।

বাঙালির হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ সন্তান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান 'জাতির পিতা' বলে সংবিধানে স্থান লাভ করেন। তাঁর নাম যুক্ত হয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জর্জ ওয়াশিংটন, চীনের মাও সেতুং, ইন্দোনেশিয়ার সুকর্নো, ভিয়েতনামের হো চি মিন, তুরস্কের কামাল আতাতুর্ক, ঘানার নক্রুমা, ভারতের মহাত্মা গান্ধীর নামের তালিকায়, যাঁরা স্ব স্ব জাতির জাগরণ ও মুক্তির জ্বলন্ত প্রতীকে পরিণত হয়েছেন। শুধু তাই নয়, আমাদের এ বিষয়টিও মনে রাখা ভালো যে, হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায় মিলিয়েই খুব কম বাঙালি আছেন, যাঁরা তীব্র বিতর্কিত আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক-ধর্মীয় পটভূমি ও পরিস্থিতি পাড়ি দিয়ে আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক ক্ষেত্রে, চিন্তায়, কর্মে ও মননচর্চায় সর্বজনগ্রাহ্য রূপে বরণীয় হয়েছেন এবং জীবন ও মৃত্যুর সীমানা ছিন্ন করে স্বমহিমায় বিরাজমান রয়েছেন। এমন নমস্য বাঙালির তালিকা খুব বেশি দীর্ঘ নয়। বঙ্গবন্ধু সেই অত্যল্প কীর্তি বাঙালির একজন, যিনি একই সঙ্গে 'বিবিসি' পরিচালিত সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালির তালিকায় শীর্ষ স্থানের অধিকারী।[২৬] উল্লেখ্য, ২০০৪

সালে 'বিবিসি বাংলা' একটি 'শ্রোতা জরিপ'-এর আয়োজন করে। যে জরিপটি শুধু অভিনবই ছিল না, ছিল জরুরিও। ফলে অত্যন্ত নিরপেক্ষ, পক্ষপাতহীন, বস্তুনিষ্ঠ ও নৈর্ব্যক্তিক ছিল জরিপের যাবতীয় কার্যক্রম। জরিপের জ্ঞাতব্য বিষয়টি ছিলো, 'সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি কে?' তিরিশ দিনের ওপর চালানো জরিপে শ্রোতাদের ভোটে নির্বাচিত শ্রেষ্ঠ ২০ জনের জীবন নিয়ে 'বিবিসি বাংলা'য় বেতার অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয় ২০০৪ সালের ২৬ মার্চ থেকে ১৫ এপ্রিল পর্যন্ত।

'বিবিসি বাংলা'র সেই জরিপে শ্রোতাদের মনোনয়নে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি হন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তালিকায় পর্যায়ক্রমে পরবর্তী অন্যরা হলেন: ২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ৩. কাজী নজরুল ইসলাম, ৪. শেরে বাংলা একে ফজলুল হক, ৫. নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বোস, ৬. বেগম রোকেয়া, ৭. বিজ্ঞানী জগদীশ চন্দ্র বসু, ৮. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ৯. মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, ১০. রামমোহন রায়, ১১. তিতুমীর, ১২. ফকির লালন শাহ, ১৩. সত্যজিৎ রায়, ১৪. অমর্ত্য সেন, ১৫. ভাষা শহীদ, ১৬. ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, ১৭. সামী বিবেকানন্দ, ১৮. অতীশ দীপঙ্কর, ১৯. জিয়াউর রহমান, ২০. হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী।[২৭]

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি হিসাবে কালোত্তীর্ণ হওয়ার নেপথ্যে মহীরুহ-সম বঙ্গবন্ধুর একটি মাত্র প্রধান কৃতিত্ব চিহ্নিত করা দুঃসাধ্য। কারণ, বাঙালির মুক্তির স্মারক বঙ্গবন্ধু একটি জীবন ও একজন ব্যক্তি মাত্র নন, তিনি একটি দর্শন, একটি চেতনা, একটি অগ্নিশিখা, একটি জাতির সফল সংগ্রাম এবং স্বাধীন অভ্যুদয়ের প্রতিভূ। যাঁর রাজনৈতিক জীবন ও আদর্শিক দর্শনের মধ্যে সমগ্র বাঙালি জাতির অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মুক্তির পথ নিহিত রয়েছে। বাঙালির সার্বিক মুক্তি ও কল্যাণের সংগ্রাম আর সাফল্যে উদ্ভাসিত বঙ্গবন্ধু কালজয়ী। বাংলাদেশ ও বাঙালির স্বাধীনতা, সমাজ, অর্থনীতি, রাজনীতি, সংস্কৃতি ও সভ্যতার অগ্রগমনের পথযাত্রায়ও তিনি চিরজাগ্রত।

বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবর্ষ উপলক্ষ্যে (২০২০) 'মুজিববর্ষ'-এর বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানমালায় উদ্বেলিত হয়েছে সমগ্র বাংলাদেশ ও বাঙালি জাতিসত্তা এবং সারা বিশ্ব। বাঙালির ঐক্য ও মুক্তির প্রতীক, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, বঙ্গবন্ধুর স্মরণে বৈশ্বিক মহামারি করোনাকালে বিরূপতাকে উপেক্ষা করে বিশ্বনেতৃত্বকে সঙ্গে নিয়ে বাঙালি জাতি গভীর শ্রদ্ধায় ও অসীম কৃতজ্ঞতায় স্মরণ করেছে বঙ্গবন্ধুর সংগ্রামী জীবন ও স্বর্ণালী সাফল্যকে। অতীতের হিরন্ময় দ্যুতিতে বঙ্গবন্ধু আলোকবর্তিকা রূপে প্রোজ্জ্বল আলো বিকিরণ করেছেন বাঙালি জাতি ও বাংলাদেশের সমৃদ্ধ বর্তমান আর উন্নত ভবিষ্যতের মহাযাত্রাপথে। এক মহীয়সী কবির[২৮] ভাষায় শতবর্ষের মাহেন্দ্রক্ষণে দেদীপ্যমান হয়েছেন বাঙালির ঐক্য ও

মুক্তির প্রতীক, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, বাংলাদেশের স্থপতি, বাঙালির আশা ও ঐক্যের প্রতীক, জাতির পিতা, বাঙালির হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ সন্তান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান:

> "এই বাংলার আকাশ-বাতাস, সাগর-গিরি ও নদী
> ডাকিছে তোমারে বঙ্গবন্ধু, ফিরিয়া আসিতে যদি
> হেরিতে এখনও মানবহৃদয়ে তোমার আসন পাতা
> এখনো মানুষ স্মরিছে তোমারে, মাতা-পিতা-বোন-ভ্রাতা।"[২৯] ♦

তথ্য নির্দেশ

১. রাজনৈতিক ও সমাজতাত্ত্বিক তত্ত্বের আলোকে এলিট হলো এমন একটি অভিজাত সমাজের শক্তিশালী ছোট গোষ্ঠী, যারা সমাজের অধিকাংশ সম্পদ, বিশেষাধিকার, রাজনৈতিক ক্ষমতা কুক্ষিগত করে। সরকার, যেকোনও ব্যবস্থায়, সদাসর্বদা এবং সর্বত্র এলিটদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। এই ধারণাটির সূত্রপাত ধ্রুপদী রাষ্ট্রদার্শনিক প্লেটো করলেও প্যারেটো, মিশেল, মস্কা প্রমুখ পরবর্তীকালে এ সংক্রান্ত বিস্তারিত তাত্ত্বিক চর্চা করেছেন। আরও দেখুন, মোহাম্মদ আবদুর রশীদ, *রাজনীতি ও সমাজবিজ্ঞান জ্ঞানকোষ* (১ম খণ্ড), ঢাকা: অনিন্দ্য প্রকাশ, ২০১৬, পৃ. ৩৪০।

২. বিস্তারিত দেখুন, মাহফুজ পারভেজ, *বাংলাদেশের রাজনীতি ও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব*, ঢাকা: গতিধারা, ২০০০.

৩. হায়াৎ মামুদ, (ভূমিকা), আতিউর রহমান, *শেখ মুজিব: বাংলাদেশের আরেক নাম*, ঢাকা: আলোঘর প্রকাশনা, ২০১৮।

৪. প্রাগুক্ত।

৫. মমতাজউদ্দীন আহমদ, এম. নজরুল ইসলাম (সম্পা.), *বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্মারকগ্রন্থ*, ১ম খণ্ড, ঢাকা: জ্যোৎস্না পাবলিশার্স, ২০১২ পৃ. ৩৮৯.

৬. Moudud Ahmed, *Bangladesh: Era of Sheikh Mujibur Rahman*, Dhaka: University Press Limited, 1993, p. 263.

৭. 'অভ্যন্তরীণ উপনিবেশবাদ' (Internal Colonialism) একটি রাষ্ট্রের বিভিন্ন অঞ্চলগুলোর মধ্যে অসম কাঠামোগত শক্তির ধারণা। বরার্ট ব্লনার অভ্যন্তরীণ উপনিবেশবাদ তত্ত্বের বিকাশকারী রূপে বিবেচিত হন। হামজা আলাভি পাকিস্তান রাষ্ট্রের মধ্যে অভ্যন্তরীণ উপনিবেশবাদী বৈশিষ্ট্য নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। দেখুন, Hamza Alavi, "The State in Post-Colonial Societies: Pakistan and Bangladesh", *New Left Review*, 1/74, July/August, 1972.

৮. এম. নজরুল ইসলাম, "শেখ মুজিবের রাজনৈতিক উত্থান", মাহফুজ পারভেজ (সম্পা.), *শেখ মুজিব: জীবন ও রাজনীতি*, ঢাকা: মাজহারুন-নূর ফাউন্ডেশন-রেক্স পাবলিকেশন্স, ২০০৭, পৃ. ২১.

৯. শেখ হাসিনা (ভূমিকা), শেখ মুজিবুর রহমান, *কারাগারের* রোজনামচা, ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ২০১৭, পৃ. ১৬.

১০. বঙ্গবন্ধুর কৃষকপ্রীতি সংক্রান্ত বিস্তারিত আলোচনার জন্য, দেখুন, আতিউর রহমান, *শেখ মুজিব: বাংলাদেশের আরেক নাম*, ঢাকা: আলোঘর প্রকাশনা, ২০১৮.

১১. মোহাম্মদ আবদুল হাকিম, 'আমলাতন্ত্রের সংস্কার প্রসঙ্গে শেখ মুজিব', মাহফুজ পারভেজ (সম্পা.), *শেখ মুজিব: জীবন ও রাজনীতি*, ঢাকা: মাজহারুন-নূর ফাউন্ডেশন-রেক্স পাবলিকেশন্স, ২০০৭, পৃ. ৩৫.

১২. বঙ্গবন্ধুর শাসনকালের বিস্তারিত মূল্যায়ন ও পর্যালোচনার জন্য, দেখুন, মাহফুজ পারভেজ (সম্পা.), *শেখ মুজিব: জীবন ও রাজনীতি*, ঢাকা: মাজহারুন-নূর ফাউন্ডেশন-রেক্স পাবলিকেশন্স, ২০০৭. আতিউর রহমান, *শেখ মুজিব: বাংলাদেশের আরেক নাম*, ঢাকা: আলোঘর প্রকাশনা, ২০১৮.

Talukder Maniruzzaman, *Radical Politics and the Emergence of Bangladesh*, Dhaka: Bangladesh Books International Ltd., 1975.
Talukder Maniruzzaman, *The Bangladesh Revolution and its Aftermath*, Dhaka: University Press Limited, 1988.
M. A Muhith, *Bangladesh: Emergence of a Nation*, Dhaka: University Press Limited, 1978.
Nurul Islam, *Development Planning in Bangladesh: A Study in Political Economy*, London: C. Hurst and Company, 1977.
Mahfuz Parvez, "The Fall of Parliamentary Democracy in Post-Liberation Bangladesh (1972-75): Causes and Consequences", Presented in a Seminar held in Jahangirnagar University, Dhaka on June 5, 1994.
Shayamali Ghosh, *The Awami League 1949-1971*, Dhaka: Academic Publishers, 1990.

১৩. বাংলাদেশের প্রথম স্বাধীনতা বার্ষিকীতে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ, বিস্তারিত, দেখুন, *Bangladesh Documents*, Vol. 1, Dacca: Ministry of External Affairs, Government of the People's Republic of Bangladesh. N.d. p. 11.

১৪. Ministry of Law and Parliamentary Affairs, Government of the People's Republic of Bangladesh, *The Constitution of the people's Republic of Bangladesh*, Dacca: Bangladesh Government Press, 1972, p. 1.

১৫. আতিউর রহমান, *শেখ মুজিব: বাংলাদেশের আরেক নাম*, ঢাকা: আলোঘর প্রকাশনা, ২০১৮, পৃ. ১০৬.

১৬. বিস্তারিত দেখুন, Nurul Islam, *Development Planning in Bangladesh: A Study in Political Economy*, London: C. Hurst and Company, 1977.

১৭. বিস্তারিত দেখুন, Rounaq Jahan, *Pakistan: Failure in National* Integration, New York: Columbia University Press, 1972.

১৮. বিস্তারিত দেখুন, Rounaq Jahan, *Bangladesh Politics: Problems and Issues*, Dacca: University Press Ltd., 1980.

১৯. বিস্তারিত দেখুন, Zillur R. Khan, "Leadership, Parties and Politics in Bangladesh", *Western Political Quarterly*, 29, No. 1, March 1976.

২০. শেখ মুজিবুর রহমান, *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, ঢাকা: ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ২৯১৭, পৃ. ৪৭-৪৮.

২১. শেখ হাসিনা (ভূমিকা), শেখ মুজিবুর রহমান, *কারাগারের* রোজনামচা, ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ২০১৭, পৃ. ১৩-১৪.

২২. শেখ মুজিবুর রহমান, *আমাদের বাঁচার দাবি-৬ দফা কর্মসূচি*, ঢাকা: পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ, ২০ সেপ্টেম্বর, ১৯৬৬, পৃ. ২.

২৩. নির্বাচনের ফলাফল সম্পর্কে বিস্তারিত দেখুন, Craig Baxter, "Pakistan Votes-1970", *Asian Survey*, Vol. 11, No. 3 (March, 1971), pp.197-218.

২৪. ৭ই মার্চ ঢাকার রমনার রেসকোর্স ময়দানের ঐতিহাসিক জনসভা ছিল জনসমুদ্রতুল্য। বঙ্গবন্ধুর সেই ভাষণ ছিল পৃথিবীর রাজনৈতিক ইতিহাসে মাইলফলক স্বরূপ। 'বীর বাঙালি অস্ত্র ধর, বাংলাদেশ স্বাধীন কর, তোমার দেশ আমার দেশ বাংলাদেশ বাংলাদেশ, তোমার আমার ঠিকানা, পদ্মা,

মেঘনা, যমুনা' এসব গগনস্পর্শী স্লোগানে সারা ময়দান মুখরিত হয়ে উঠেছিল। ভাষণের বিস্তারিত বিবরণ দেখুন, *বজ্রকণ্ঠ*, ঢাকা: গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তথ্য দফতর, ৭১/৭২, পৃ. ৩-৬.

২৫. এম. নজরুল ইসলাম, 'শেখ মুজিবের রাজনৈতিক উত্থান', মাহফুজ পারভেজ (সম্পা.), *শেখ মুজিব: জীবন ও রাজনীতি*, ঢাকা: মাজহারুন-নূর ফাউন্ডেশন-রেক্স পাবলিকেশন্স, ২০০৭, পৃ. ৩০.

২৬. বেশ সময় নিয়ে ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ, অঞ্চল, বিশ্বাস নির্বিশেষে ব্যাপক মানুষের অংশগ্রহণে পরিচালিত এই জরিপের ফলকে বিশ্বাসযোগ্য ও প্রতিনিধিত্বশীল বলার সঙ্গত কারণ রয়েছে এবং জরিপের বিষয়ে সর্বমহলের সম্মতির সঙ্গে সঙ্গে কারোই কোনো আপত্তির কথা জানা যায় নি। জরিপে বৈশ্বিক বাঙালি অংশগ্রহণকারীদের সামগ্রিক মনোভাব তুলে ধরার বিশ্বস্ত ও বস্তুনিষ্ঠ প্রয়াস সুস্পষ্ট। বিস্তারিত দেখুন, মাহফুজ পারভেজ, *দ্বিশত জন্মবর্ষে বিদ্যাসাগর*, ঢাকা: স্টুডেন্ট ওয়েজ, ২০২১, পৃ. ২৪.

২৭. এ সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য জানা যাবে 'বিবিসি বাংলা'র ওয়েবসাইটে।

২৮. তিনি বিখ্যাত কবি সুফিয়া কামাল (৩০ জুন ১৯১১-২০ নভেম্বর ১৯৯৯)। যেখানে অন্যায় সেখানেই তিনি। যেখানে অন্ধকার ও কুসংস্কার, সেখানেই আলোর মশাল হাতে তাঁর দীপ্ত উপস্থিতি। বেগম সুফিয়া কামাল 'জননী সাহসিকা' নামে সমধিক খ্যাত, বাঙালির শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব তিনি। বিস্তারিত দেখুন, মাহফুজ পারভেজ, "বেগম সুফিয়া কামাল: জননী সাহসিকা", *বার্তা২৪.কম*, ২০ নভেম্বর, ২০১৮.

২৯. কবি সুফিয়া কামালের 'ডাকিছে তোমারে' কবিতার প্রথমাংশ।

গ্রন্থপঞ্জি

বাংলা

১. শেখ মুজিবুর রহমান, *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, ঢাকা: ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ২৯১৭.

২. শেখ মুজিবুর রহমান, *কারাগারের* রোজনামচা, ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ২০১৭.

৩. শেখ মুজিবুর রহমান, *আমাদের বাঁচার দাবি-৬ দফা কর্মসূচি*, ঢাকা: পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ, ২০ সেপ্টেম্বর, ১৯৬৬.

৪. *বজ্রকণ্ঠ*, ঢাকা: গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তথ্য দফতর, ৭১/৭২.

৫. আতিউর রহমান, *শেখ মুজিব: বাংলাদেশের আরেক নাম*, ঢাকা: আলোঘর প্রকাশনা, ২০১৮.

৬. মোহাম্মদ আবদুর রশীদ, *রাজনীতি ও সমাজবিজ্ঞান জ্ঞানকোষ* (১ম খণ্ড), াকা: অনিন্দ্য প্রকাশ, ২০১৬.

৭. এম. নজরুল ইসলাম (সম্পা), *বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্মারকগ্রন্থ*, ১ম খণ্ড, ঢাকা: জ্যোৎস্না পাবলিশার্স, ২০১২.

৮. মাহফুজ পারভেজ, *বাংলাদেশের রাজনীতি ও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব*, ঢাকা: গতিধারা, ২০০০.

৯. মাহফুজ পারভেজ (সম্পা), *শেখ মুজিব: জীবন ও রাজনীতি*, ঢাকা: মাজহারুন-নূর ফাউন্ডেশন-রেক্স পাবলিকেশন্স, ২০০৭.

১০. মাহফুজ পারভেজ, "বেগম সুফিয়া কামাল: জননী সাহসিকা", *বার্তা২৪.কম*, ২০ নভেম্বর, ২০১৮.

১১. মাহফুজ পারভেজ, *দ্বিশত জন্মবর্ষে বিদ্যাসাগর*, ঢাকা: স্টুডেন্ট ওয়েজ, ২০২১.

ইংরেজি

1. *Bangladesh Documents,* Vol. 1, Dacca: Ministry of External Affairs, Government of the People's Republic of Bangladesh. N.d.

2. Craig Baxter, "Pakistan Votes-1970", *Asian Survey*, Vol. 11, No. 3 (March, 1971).
3. Hamza Alavi, `The State in Post-Colonial Societies: Pakistan and Bangladesh', *New Left Review*, 1/74, July/August, 1972.
4. M. A Muhith, *Bangladesh: Emergence of a Nation*, Dhaka: University Press Limited, 1978.
5. Mahfuz Parvez, 'The Fall of Parliamentary Democracy in Post-Liberation Bangladesh (1972-75): Causes and Consequences', Presented in a Seminar held in Jahangirnagar University, Dhaka on June 5, 1994.
6. Moudud Ahmed, *Bangladesh: Era of Sheikh Mujibur Rahman*, Dhaka: University Press Limited, 1993.
৭. Ministry of Law and Parliamentary Affairs, Government of the People's Republic of Bangladesh, *The Constitution of the people's Republic of Bangladesh*, Dacca: Bangladesh Government Press, 1972.
8. Nurul Islam, *Development Planning in Bangladesh: A Study in Political Economy*, London: C. Hurst and Company, 1977.
9. Rounaq Jahan, *Pakistan: Failure in National* Integration, New York: Columbia University Press, 1972.
10. Rounaq Jahan, *Bangladesh Politics: Problems and Issues*, Dacca: University Press Ltd., 1980.
11. Shayamali Ghosh, *The Awami League 1949-1971*, Dhaka: Academic Publishers, 1990.
12. Talukder Maniruzzaman, *Radical Politics and the Emergence of Bangladesh*, Dhaka: Bangladesh Books International Ltd., 1975.
13. Talukder Maniruzzaman, *The Bangladesh Revolution and its Aftermath*, Dhaka: University Press Limited, 1988.
14. Zillur R. Khan, "Leadership, Parties and Politics in Bangladesh", *Western Political Quarterly*, 29, No. 1, March 1976.

লেখক : প্রফেসর, রাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

ইসলামে দেশপ্রেম ও বঙ্গবন্ধুর ইসলামী খেদমত

মুহাম্মদ মিযান বিন রমজান

স্বাধীন সোনার বাংলাদেশ

বছর ঘুরে ফিরে এলো বিজয় দিবস। বিজয় আনন্দে উচ্ছাসিত লাল সবুজের এ মাটি। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বরের এ দিনে অর্জন হয়েছিল মহান বিজয়। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী থেকে মুক্ত হয়েছিল আমাদের এই দেশ। ৩০ লক্ষ শহীদের রক্তে সে দেশটির পতাকা অংকিত হয়েছে লাল সবুজ রঙে। পৃথিবীর মানচিত্রে জন্ম নিয়েছে এক নাম, সে নাম আমার গৌরব সে নাম ইতিহাস, সে নাম আমার চিরচেনা সবার জানা বাংলাদেশ। দশের প্রতি মায়া-মমতা ও ভালোবাসা থেকে লাল সবুজের পতাকা হাতে স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন লাখো বাঙালি। শহিদ হয়েছিল লাখো মায়ের সন্তান। যাদের বিনিময়ে আজকে আমাদের এ বিজয় উদযাপন।

ইসলামে দেশপ্রেমের গুরুত্বও অত্যাধিক। প্রবাদ আছে, 'হুব্বুল ওয়াতানে মিনাল ঈমান' দেশকে ভালোবাসা ঈমানের অঙ্গ। দেশপ্রেম ঈমানের অঙ্গ বলে অনেক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। নিজ দেশ অর্থাৎ স্বদেশের প্রতি ভালোবাসা চিরন্তন, শাশ্বত সত্য বলে ইসলামে দিকনির্দেশনা দেয়া হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, তোমরা আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য কর এবং তোমাদের ন্যায়পরায়ণ শাসকের আদেশ মেনে চল।[১]

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, দেশ রক্ষার্থে একদিন এক রাতের প্রহরা- ক্রমাগত এক মাসের নফল রোযা এবং সারারাত ধরে ইবাদতে কাটিয়ে দেয়ার চেয়ে উত্তম।[২]

দেশের স্বাধীনতা রক্ষার প্রতি গুরুত্বারোপ করে আল্লাহর রাসূল (সা) বলেছেন, যে চোখ দেশের সীমান্ত রক্ষায় বিনিদ্র থাকে সে চোখকে জাহান্নাম স্পর্শ করবে না। মা-মাটি, মাতৃভাষা, দেশপ্রেম এত ইসলামের সুর।

পবিত্র কুরআনে দেশপ্রেমের আদেশ

পবিত্র কুরআনে 'ওয়াতান' বা (মাতৃভূমির আরবি) মাতৃভূমি অর্থে নয়, সাধারণ স্থান অর্থে। মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন, 'আল্লাহ তোমাদের সাহায্য করেছেন বহু স্থানে।[৩] কুরআন

তবে কুরআনের একাধিক আয়াতে দেশ ও মাতৃভূমির ভালোবাসাকে অনুপ্রাণিত করা হয়েছে। প্রশ্ন হতে পারে, কুরআনে মাতৃভূমি ও দেশের কথা স্পষ্টত নেই কেন? অথচ তার ইঙ্গিত রয়েছে একাধিক স্থানে। উত্তর হলো, কুরআনে দেশ ও মাতৃভূমির কথা উলেখ করা হয়নি কারণ দেশপ্রেম মানবপ্রকৃতির অংশ। যেমন– কুরআনের একাধিক জায়গায় সন্তানকে মা-বাবার প্রতি উত্তম আচরণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু কুরআনে সন্তানের প্রতি ভালো আচরণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়নি। কেননা সন্তানের ভালোবাসা মানবপ্রকৃতির দাবি।

স্বদেশের প্রতি নবীজির ভালোবাসা

পবিত্র কুরআনের বর্ণনায় একাধিক নবীকে শাস্তি হিসেবে দেশ থেকে বহিষ্কার করার হুমকি দিতে দেখা যায়। যা থেকে প্রমাণিত হয় সকল নবী-রাসূল (আ) দেশকে ভালোবাসতেন। ইরশাদ হয়েছে, 'তাদের সম্প্রদায়ের দাম্ভিক নেতারা বলল, হে শোয়াইব! আমরা তোমাকে এবং তোমার সঙ্গে যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে আমাদের জনপদ থেকে বহিষ্কৃত করবই অথবা তোমাদেরকে আমাদের ধর্মাদর্শে ফিরে আসতে হবে। সে বলল, যদিও আমরা তা ঘৃণা করি তবুও?[৪]

আয়াতে শোয়াইব (আ) ও তাঁর অনুসারীদের দেশ থেকে বের করে দেওয়ার হুমকি দেওয়া হচ্ছে এবং তারা বলছে, দেশত্যাগ ও শিরককে আমরা ঘৃণা করি।

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে, 'অবিশ্বাসীরা তাদের রাসূলদের বলেছিল, আমরা তোমাদেরকে আমাদের দেশ থেকে অবশ্যই বহিষ্কৃত করব। অথবা তোমাদেরকে আমাদের ধর্মাদর্শে ফিরে আসতে হবে।[৫]

রাসূলকে জন্মভূমিতে ফেরানোর অঙ্গীকার

মক্কা থেকে মদিনায় হিজরতের সময় মহানবী (সা) যখন গারে সুর থেকে বের হয়ে মদিনার পথ ধরেন, তখন বারবার অশ্রুসিক্ত হয়ে মক্কার দিকে তাকাচ্ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর হৃদয়ের ব্যাকুলতা দেখে তাঁকে মাতৃভূমিতে ফিরিয়ে আনার অঙ্গীকার করেন। বলেন, 'নিশ্চয়ই যিনি আপনার জন্য কুরআনকে বিধান করেছেন তিনি আপনাকে অবশ্যই জন্মভূমিতে ফিরিয়ে আনবেন।[৬]

মাতৃভূমির জন্য রাসূলের কান্না

মহানবী (সা) মাতৃভূমিতে শত অত্যাচার ও অবিচারের শিকার হওয়ার পরও দেশত্যাগের সময় অশ্রু বিসর্জন করেন। তিনি বলেন, 'আল্লাহর শপথ! তুমি (মক্কা) আল্লাহর গোটা জমিনের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ এবং দুনিয়ার সব ভূমির মধ্যে তুমি আমার কাছে সর্বাধিক প্রিয়। আল্লাহর শপথ! তোমার থেকে আমাকে উচ্ছেদ করা না হলে আমি চলে যেতাম না।[৭]

- **নির্বাসনকারীদের প্রতি অভিশাপ**

  মহানবী (সা) মক্কার মুশরিক নেতাদের বিরুদ্ধে আল্লাহর কাছে বদদোয়া করেন এবং তার কারণ হিসেবে উল্লেখ করেন দেশান্তরকে। মহানবী (সা) বলেন, 'হে আল্লাহ! আপনি শায়বা ইবনু রাবিআ, উতবা ইবনু রাবিআ এবং উমাইয়া ইবনু খালফের প্রতি অভিশাপ বর্ষণ করুন; যেমনিভাবে তারা আমাদের মাতৃভূমি হতে বের করে মহামারির দেশে ঠেলে দিয়েছে।[৮]

- **দেশপ্রেমের অনুরূপ ভালোবাসা প্রার্থনা**

  মহানবী (সা) মাতৃভূমির ভালোবাসাকে দৃষ্টান্ত হিসেবে উপস্থাপন করে তার অনুরূপ ভালোবাসা প্রার্থনা করেছেন। তিনি দোয়া করেন, 'হে আল্লাহ! মদিনাকে আমাদের কাছে মক্কার মতো বা তার চেয়েও বেশি প্রিয় করে দাও।[৯]

- **স্বদেশকে ভোলেননি মহানবী (সা)**

মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করতে বাধ্য হলেও মাতৃভূমিকে কখনো ভোলেননি তিনি। ইবনে শিহাব থেকে বর্ণিত, মক্কা থেকে উসাইল গিফারি (রা) মদিনায় এলে তিনি মক্কার অবস্থা সম্পর্কে জানতে চান। তিনি মক্কার অধঃপতিত অবস্থার বর্ণনা শুরু করলে মহানবী (সা) তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বলেন, আমাদের ব্যথিত করো না উসাইল এবং তাঁর দুই চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরছিল।[১০]

- উল্লিখিত আয়াত ও হাদিসের বর্ণনা ও ভঙ্গি থেকে স্পষ্ট হয় ইসলাম মাতৃভূমির প্রতি মানুষের স্বভাবজাত ভালোবাসাকেই জাগ্রত করার প্রয়াস পেয়েছে। যেন তাদের অনুভব জুড়ে মাতৃভূমি ও তাঁর প্রকৃতির প্রতি ভালোবাসা জাগ্রত থাকে। মহানবী (সা) মক্কার পাহাড়-পর্বত ও প্রকৃতির সঙ্গেও অন্তপ্রাণ ভালোবাসা পোষণ করতেন। তিনি বলেছেন, 'নিশ্চয়ই আমি মক্কার একটি পাথরকে চিনি, যেটি নবুয়ত লাভের আগেই আমাকে সালাম দিত। আমি সেটাকে এখনো চিনি।[১১]

স্বদেশ প্রেম প্রত্যেক নাগরিকের দায়িত্ব ও কর্তব্য

আল্লাহর রাসূল নিজে স্বদেশকে ভালোবেসে আমাদের জন্য নমুনা উপস্থাপন করে গেছেন। রাসূল (সা) তাঁর দেশ মক্কাকে অন্তর দিয়ে ভালোবাসতেন, মক্কার জনগণকে ভালোবাসতেন। তাদের হেদায়াতের জন্য তিনি কঠোর অত্যাচার-নির্যাতন সহ্য করেছেন। কোনোদিন মক্কাবাসীর অকল্যাণ পর্যন্ত কামনা করেননি। তায়েফে এত নির্যাতন করল তারপরও কোনো বদদোয়া করেননি।

মহানবী (সা) সাহাবিদের কাফিরদের অত্যাচারে আবিসিনিয়ায় হিজরতের অনুমতি দিলেও তিনি মক্কায় নির্যাতন সহ্য করে অবস্থান করলেন। পরিশেষে কাফিরদের কঠিন ষড়যন্ত্রের কারণে এবং আল্লাহ তায়ালার নির্দেশে তিনি যখন মদিনায় হিজরত করেন, তখন মক্কার দিকে বারবার ফিরে তাকান। আর কাতর কণ্ঠে বলেন, ও আমার দেশ, তুমি কত সুন্দর! আমি তোমাকে ভালোবাসি। আমার আপন জাতি যদি ষড়যন্ত্র না করত, আমি কখনো তোমাকে ছেড়ে যেতাম না।

সাহাবিরাও স্বদেশ ভূমি পবিত্র মক্কাকে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসতেন। আল্লাহর রাসূল (সা) মক্কা থেকে হিজরতের সময় বলেছিলেন, 'হে মক্কা! আমাকে যদি এর অদিবাসীরা বের করে না দিত তাহলে আমি তোমার বুকেই বসবাস করতাম'।

আমরা আমাদের বিজয় এবং দেশপ্রেমকে যদি ইসলামের আলোকে দেখি তাহলে আমরা দেখব এসবই আমাদের জাতির গৌরবের, আনন্দের, অহঙ্কারের, আত্মমর্যাদার। ১৯৭১ সালে এক সাগর রক্তের বিনিময়ে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে বিশ্বের

মানচিত্রে স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হয়। এর আগে হাজার বছরের বাঙালি জাতির স্বাধীন কোনো রাষ্ট্র ছিল না। হাজার বছরের বাঙালি জাতির আন্দোলন-সংগ্রামের ফসল বাঙালি জাতির নিজস্ব আবাসভূমি।

এ বিজয় ছিনিয়ে আনতে দীর্ঘ নয় মাস সংগ্রাম করতে হয়েছে আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতে নিরস্ত্র বাঙ্গালীদের ওপর শুরুহয় কামানের গোলাবর্ষণ। নিরস্ত্র বাঙালি অতর্কিত আক্রমণে দিশেহারা প্রায়। মুক্তির লক্ষ্যে শুরু বীর বাঙালীর মুক্তি সংগ্রাম। দীর্ঘ ৯ মাসের রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম ৩০ লক্ষ প্রাণের আত্মদান, অত্যাচার-নির্যাতন ও কারাভোগের মাধ্যমে অবশেষে অর্জিত হয় বিজয়। আজকের ১৬ ডিসেম্বর দীর্ঘ ২৪ বছরের সংগ্রাম ও ৯ মাসের রক্তক্ষয়ী সশস্ত্র যুদ্ধের ফসল।

এ দিবসে আনন্দ উদযাপন ও সেমিনার-সিম্পোজিয়াম ইসলামে নিষিদ্ধ নয়। বরং ইতিহাস বিকৃত না করে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করতে এ দিবসটিকে যথাযথ মর্যাদার সঙ্গে উদযাপন করা জরুরি। পাশাপাশি দেশের বিজয়ের জন্য রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে আত্মদানকারী সব শহিদদের স্মরণ ও দোয়া মুনাজাত করা দেশের প্রতিটি নাগরিকের ঈমানের একান্ত দাবি।

যদিও বর্তমান সময়ে অনেকেই মনে করেন যে, বিজয় দিবস উদযাপন মানেই ইসলামের অবমাননা। বিষয়টি তা নয়; কারণ বিশ্বমানবতার মুক্তির দূত সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী ও রাসূল হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেও বিজয় দিবস উদযাপন করেছিলেন।

তিনি ইসলাম প্রচারের কারণে নিজের মাতৃভূমি ত্যাগ করে হিজরত করেছিলেন মদিনায়। দীর্ঘ ১০ বছর নির্বাসিত জীবন কাটানোর পর সফলতার সঙ্গে নিজ দেশ স্বাধীন করেন। অর্জন করেন মহান স্বাধীনতা ও বিজয়। নবীজী (সা) মক্কা বিজয়ের আনন্দে প্রথমেই তিনি ৮ রাকাআত নামায আদায় করেছিলেন। আর তিনি এত অধিক পরিমাণে আনন্দ লাভ করেছিলেন যা ভাষায় ব্যক্ত করার মতো নয়।

তাইতো মক্কা বিজয়ের আনন্দে তিনি সেদিন ঘোষণা করেছিলেন, 'যারা কাবা ঘরে আশ্রয় নিবে তারা নিরাপদ। এভাবে মক্কার সম্ভ্রান্ত কয়েকটি পরিবারের ঘরে যারা আশ্রয় নিবে; তারা যত অত্যাচার নির্যাতনকারীই হোক তারাও নিরাপদ। এ ছিল প্রিয়নবীর মক্কা বিজয়ের আনন্দ উৎসবের ঘোষণা।

দেশপ্রেম যেমন ঈমানের অঙ্গ, তেমিন দেশের জাতীয় পতাকার প্রতি সম্মান ও মর্যাদা দেয়া আবশ্যক। বিজয় দিবসে দেশের প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সম্মানের

সঙ্গে এ পতাকা উত্তোলন করাও ঈমানের দাবি। চাই হোক তা সরকারি প্রতিষ্ঠান কিংবা বেসরকারি প্রতিষ্ঠান; হোক তা মাদরাসা আর হোক তা মসজিদ।

প্রিয়নবীর উল্লিখিত হাদিসটিই তো বাঙালি জাতির বিজয় দিবস উদযাপনের জন্য যথেষ্ট। তিনি বলেছেন, 'আল্লাহর পথে এক দিন ও এক রাত (দেশের) সীমানা পাহারা দেয়া এক মাস রোযা পালন ও এক মাসব্যাপী রাত জাগরণ করে নামায আদায়ের চেয়ে বেশি কল্যাণকর। আর এ অবস্থায় যদি ওই ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করে; তবে যে কাজ সে করে যাচ্ছিল, মৃত্যুর পরও তা তার জন্য অব্যাহত থাকবে; তার রিজিক অব্যাহত থাকবে; কবর ও হাশরে ওই ব্যক্তি ফেতনা থেকে মুক্ত থাকবে।[১২]

বঙ্গবন্ধুর ইসলামী খেদমত

প্রতিদিন সূর্য উঠে খোলা আকাশে। সন্ধ্যায় অস্তমিত হয়। আবার উঠে। আবারো অস্তমিত হয়। আকাশে সূর্যের রোজানা গৎবাঁধা আনাগোনার মধ্য দিয়ে জমিনের বুকে জন্ম নেয় হাজারো সূর্য। সূর্য কখনো অস্ত হয় না। মানুষ জনম জনম ধরে আলো গ্রহণ করতে পারে। তেমনি এক সূর্য উদয় হয়েছিল ১৯২০ সালে ১৭ ই মার্চ বর্তমান গোপালগঞ্জ জেলার, কোটালিপাড়া থানার, পাটগাতী ইউনিয়নে, টুংগীপাড়া গ্রামে, রোজ মঙ্গলবার রাত ৮ ঘটিকায় এক মুসলিম সম্ভ্রান্ত পরিবারে। বঙ্গবন্ধু ছিলেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি। স্বাধীন ভূখণ্ড বাংলাদেশের মহান স্থপতি। বাংলার প্রথম রাষ্ট্রপতি। উপমহাদেশের অন্যতম নিঃস্বার্থ নজিরবিহীন রাজনীতিক এক মহান ব্যক্তি। তিনি জীবনের প্রতিটি ধাপে ধাপে এ জাতির জন্য খেটেছেন। এ মাটির জন্য লড়েছেন। শরীরের ঘাম ঝরিয়েছেন। ৫৫ বছর জীবনের অধিকাংশই কেটেছে আন্দোলন, সংগ্রাম ও জেলহাজতে। তিনি ভারত বিভাজন আন্দোলন, ভাষা আন্দোলন এবং বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা সংগ্রামের মহানায়ক। পাকিস্তানের জাতীয় সংসদে তিনি নিজেকে পূর্ব বাংলার জনগণের স্বার্থে নিবেদিতপ্রাণ কর্মী হিসেবে তুলে ধরেছিলেন। সংসদ ও রাজপথে জনগণের স্বার্থ হাসিলকারী নেতা হিসেবে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখেন। নির্যাতিত-নিপীড়িত পূর্ব বাংলার জনগণকে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী শিকল ছিঁড়ে মুক্তাঙ্গণে আনেন। সর্বশেষ দেশ স্বাধীন হবার পর বাংলাদেশটাকে একটি সোনার দেশে রূপান্তরিত করার প্রয়াস চালান। দেশের বর্তমান যে উন্নতি ও অগ্রগতি চলছে সবকিছু বঙ্গবন্ধুর অবদান। তিনি শুধু দেশের উন্নতি ও অগ্রগতিতে ক্ষান্ত হননি। ইসলামের জন্যও অনেক কিছু করেছেন। আমি সামান্য দু'চারটা কথা তুলে ধরছি:

ইসলামিক লেবাসে বঙ্গবন্ধু

তিনি কতখানি ইসলাম প্রেমিক ছিলেন তার লেবাস প্রমাণ বহন করে। তাঁর সঙ্গী সহপাঠীরা শার্ট প্যান্ট পড়তেন। কিন্তু তিনি সেই শুরু থেকে সুন্নতি লেবাস পাঞ্জাবি-পায়জামা পড়েন। তিনি কিন্তু ইচ্ছে করলে পারতেন অন্য লেবাস ধরতে। অন্যান্য মুসলিম দেশের সরকার যেমনটা পড়ে থাকেন। সবাই যেহেতু শার্ট প্যান্ট পরতো, ইচ্ছে করলে তিনি পারতেন। কিন্তু মনের চাহিদা বাদ দিয়ে মাওলার চাহিদা প্রাধান্য দিয়েছিলেন। মাওলাকে রাজি করার জন্যে। তিনি একজন মুসলমান। সুতরাং তাঁর গায়ে ইসলামিক লেবাসাই মানায়।[১৩]

ঐতিহাসিক ভাষণ ইনশাআল্লাহ

ইয়াহিয়া খানের তালিবালি দেখে বঙ্গবন্ধু হাবভাব কিছুটা আঁচ করতে পারেন। তিনি বুঝে ফেলেন এ মতলবীদের মতলব বড়ই খারাপ। সোজা আঙ্গুলে ঘি উঠানো মোটেও সম্ভব না। তাই আঙুলটা বাঁকা করেন। তিনি স্বাধীনতা আন্দোলনের ডাক দেন। ৭-ই মার্চ তখনকার রেসকোর্স ময়দানে জনতার স্রোত নামে। সেখানে জাতিকে দাসত্বের বন্ধন থেকে মুক্তি করার লক্ষ্যে ঐতিহাসিক ভাষণ দেন বঙ্গবন্ধু। ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণখচিত হয়ে আছে সেই ভাষণটি। ভাষণে বলেন– এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম। এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। রক্ত যখন দিয়েছি রক্ত আরো দেবো তবুও এ দেশকে স্বাধীন করে ছাড়বো, ইনশাআল্লাহ। 'ইনশাল্লাহ' শব্দটা আল্লাহ তা'আলার কাছে বড় পছন্দ হয়েছে বলে মনে হয়। যদ্দরুন বঙ্গবন্ধু নির্বিঘ্নে সফল হতে পেরেছেন। ভবিষ্যতে যে কোন কাজ করা হবে সেটা মুখে বলার সময় ইনশাল্লাহ শব্দযোগে বলার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে– তোমরা কখনো বলোনা অবশ্যই আমি করব, ইনশাআল্লাহ বলা ছাড়া।[১৪]

বঙ্গবন্ধু আগামীতে দেশ স্বাধীন করবেন এবং সেই কথাটা ঐতিহাসিক ভাষণের বলার সময় ইনশাআল্লাহ যুক্ত করেছিলেন।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা

১৯৭৫ সালের ১৫ ই আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যা করা হয়। ঠিক এর সাড়ে ৫ মাস আগে অর্থাৎ ২২ মার্চ তিনি ইসলামি ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করেন। শহীদ হওয়ার আগে তিনি এ মহৎ কাজটি করেছেন। বর্তমান ইসলামিক ফাউন্ডেশন বিরাট আকার ধারণ করেছে। বিভাগ ও জেলায় জেলায় ইসলামিক ফাউন্ডেশনের শাখাগুলো দ্বীনের আলো ছড়াচ্ছে। সহীহ শুদ্ধভাবে ইমামতি শিক্ষার প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। মাসিক ম্যাগাজিন বের করা হয়। ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে বহির্বিশ্বে ইসলামের বার্তা পাঠানো হয়। ইসলামের অনেক কাজ করা হয়। যা বঙ্গবন্ধুর হাতে গড়া ফসল। বর্তমান সময়ে সেদিকে কড়া নজর রাখছেন তাঁর যোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।[১৫]

সরকারি অনুদানে হজ পালনের ব্যবস্থা

হজ ইসলামের পঞ্চম বেনার অন্যতম একটি। পালনকারীর জন্য আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূল সুসংবাদ দিয়েছেন। ইরশাদ হয়েছে– যে ব্যক্তি হজ করল এবং হজের সময় অনর্থক কথা ও পাপ কাজ থেকে বিরত রইলো। সে হজ থেকে প্রত্যাবর্তন করলো এমন নিষ্পাপ অবস্থায় যেন তার মা তাকে আজকে প্রসব করেছেন।[১৬]

আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! মহিলাদের উপর কি জিহাদ আছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ, তাদের উপর জিহাদ আছে। তবে তাতে যুদ্ধ নেই। সেটা হলো হজ ও ওমরা।[১৭]

হাজীসাব যখন তালবিয়া (লাব্বাইক) পাঠ করে তখন পৃথিবীতে যতো জীবজন্তু আছে সব কিছু তার সাথে তালবিয়া পাঠ করতে থাকে।[১৮]

যদি কেউ সামর্থ্যবান হবার পরও হজ না করে। তার ব্যাপারে দয়ার নবী কঠিন হুঁশিয়ারী বাক্য উচ্চারণ করেছেন। বলেছেন এমন ব্যক্তি আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নয়। বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর নানা কারণে অর্থের টানাটানি দেখা দেয়। বঙ্গবন্ধু সর্বপ্রথম সরকারি তহবিল থেকে বাংলাদেশি একটা দলকে হজে পাঠান। শুধু এখানেই ক্ষান্ত হননি বাংলাদেশের জনগণ যেন কম খরচে হজ করতে পারেন সে জন্য একটা জাহাজ ক্রয় করেন। সে জাহাজের নাম দেয়া হয়েছলো 'হিজবুল বাহার' সেই সুবাদে বর্তমান রাষ্ট্রনায়ক বঙ্গবন্ধু যোগ্য উত্তরসুরী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০১৯সালে সরকারি তহবিল থেকে দেশের শ্রেষ্ঠ উলামায়ে কেরামকে হজ্জ আদায় করার বন্দোবস্ত করেন। হাদীস শরীফে এসেছে, নেক কাজ সম্পাদনকারী আর নেক কাজের সাহায্যকারী উভয়জন সওয়াবের দিক থেকে বরাবর। সেই হিসেবে বঙ্গবন্ধুও সওয়াব থেকে খালি নয়।[১৯]

রেডিও-টিভিতে আযান ও তেলাওয়াত

তথ্যপ্রযুক্তিতে তখন ততটা তৎপর উন্নত ছিল না এবং এখনকার মতন অবাধে ইন্টারনেটের সুবিধা ছিল না। সে সময়ে সচরাচর মিডিয়া বলতেই টিভি ও রেডিও বুঝানো হতো। মুসলিম দেশ হিসেবে বঙ্গবন্ধু টিভিতে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের আযান জারি করার নির্দেশ দেন। যে ধারা এখনো অব্যাহত। পাশাপাশি বেতারের কুরআন তেলাওয়াত যুক্ত করেন। সেই স্রোতধারায় বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা খ্যাতিমান হাফেজে কুরআন দ্বারা প্রতি রমজানে আসর থেকে মাগরিব পর্যন্ত এক পারা করে তেলাওয়াতের ব্যবস্থা করেছেন। ৩০দিনে পুরো এক খতম করা হয়। যা মুসলিম জনতার চাওয়া পাওয়া ছিলো। এই সুযোগটা করে দিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু।

তাবলীগের কাজে বঙ্গবন্ধু

তাবলীগ জামাত সত্য একটি দল। সত্য তাদের কাজ। রাশিয়া সোভিয়েত ইউনিয়ন ছিলো কউমিনিস্টদের দখলে। সেখানে ইসলামের দাওয়াতের প্রয়োজন ছিলো বহু আগ থেকে। বিদেশ থেকে ইসলামের দাওয়াত নিয়ে যাওয়া সম্পূর্ণ নিষেধ ছিলো বলে তারা ইসলামের আলো থেকে বঞ্চিত ছিলো যুগ যুগ ধরে। স্বাধীনতা সংগ্রামে রাশিয়া আমাদের জন্য সাহায্যের হাত বাড়ান। তখন বঙ্গবন্ধুর সাথে আন্তরিক সম্বন্ধ গড়ে ওঠে। স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধু সে সুযোগটা কাজে লাগান। সম্পর্কের খাতিরে তাবলিগী ভাইদের পরামর্শে সেখানে তাবলীগ জামাত পাঠান। তাবলীগীরা সেখানে দ্বীনের দাওয়াত দেন। বর্তমানে বিভিন্ন দেশ থেকে তাবলীগ জামাত যেতে পারে। সেখানে দ্বীনের দাওয়াতের পরিক্রমা এখনো অব্যাহত আছে। যার ভিত্তি রচনা করেছেন বঙ্গবন্ধু।[২০]

জুয়া খেলা বন্ধ

রাজধানীর শাহবাগে অবস্থিত সোহরাওয়ার্দী উদ্যান। পূর্বনাম রেসকোর্স ময়দান। যেখানে দাঁড়িয়ে বঙ্গবন্ধু জাতিকে মুক্তি সংগ্রামের ডাক দিয়েছিলেন। স্বাধীনতার আগে সেখানে ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতা হতো। এর সাথে বিশাল জুয়ার আসর বসতো। বড় বড় জুয়াড়িরা সেখানে অংশ নিত। দেখা যেত গাছতলার মালিক দশ তলার মালিক বনে যেত। আর দশ তলার মালিক গাছ তলার বাসিন্দা হয়ে যেত। দিনদিন জুয়ার আসর বড় হতে থাকে। প্রচার-প্রসার বাড়তে থাকে। জুয়া খেলা যেহেতু নামান্তর তাই ইসলামে তা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। স্বাধীনতার পর সে নিষেধাজ্ঞার প্রতি নজর রেখে বঙ্গবন্ধু জুয়ার আসর একেবারে বন্ধ করে দেন। যাতে ভবিষ্যতে না হতে পারে সেজন্য রেসকোর্স ময়দানে অসংখ্য বৃক্ষ রোপণ করেন।**২১**

আরব যুদ্ধে সাহায্য

ইসলামে প্রয়োজন সাপেক্ষে সকল শর্ত বিদ্যমান থাকলেও যুদ্ধের অনুমতি দিয়েছে, যদি বিনা কারণে কেউ বা কারা দেশ দখল করতে চায় অথবা ধর্মের উপর হস্তক্ষেপ করতে চায় তাহলে যুদ্ধের অনুমতি আছে। ১৯৭৩ সালে আরবের সাথে ইসরাইলের যুদ্ধ বাঁধে। আরব ছিল আমাদের নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মাতৃভূমি এবং মুসলিম দেশ। বাংলাদেশও মুসলিম দেশ। সে হিসেবে মুসলিমদের সাহায্য করা একান্ত কর্তব্য। বঙ্গবন্ধু সেই সময়ে আরবের পক্ষ নেন এবং সাধ্য অনুযায়ী সাহায্যের হাত বাড়ান। যুদ্ধরত সেনাদের অসময়ে ঘুম ও ক্লান্তি দূর করার জন্য এক লাখ পাউন্ড চা এবং সেবার জন্য ২৮ সদস্যের মেডিকেল টিম পাঠান। তারপর আরব ও ইসরাইলের যুদ্ধে ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়। আরব পরবর্তীতে খুশি হয়ে বাংলাদেশের জন্য অনেক অস্ত্র পাঠিয়ে দেয়।

মুসলিম বিশ্বকে ঐক্যের আহ্বান

১৯৭৪ সালে পাকিস্তানের লাহোরে একটা ইসলামী সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারের নাম দেয়া হয় ওআইসি সম্মেলন। আমন্ত্রিত অতিথিদের মধ্যে বঙ্গবন্ধুও ছিলেন। তিনি স্বীয় বক্তৃতায় ইসলামের কিভাবে অগ্রবর্তী করা যায় এবং মুসলিম ঐক্যবদ্ধ হলে কি কি ফায়দা হবে তা বিস্তারিত তুলে ধরেন। বক্তব্য শুনে সকলে আনন্দিত হন। তখন বঙ্গবন্ধুর সাথে মুসলিম নেতাদের সুসম্পর্ক গড়ে ওঠে।

কাকরাইল মসজিদের জন্য জায়গা বরাদ্দ

বাংলাদেশের তাবলীগ জামাতের কেন্দ্রীয় মারকাজ কাকরাইল মসজিদ। সেখান থেকে ইসলামের বাণী প্রচার করা হয় পৃথিবীর সর্বত্র। বহির্বিশ্বে তাবলীগী ভাইয়েরা দ্বীনের দাওয়াত নিয়ে প্রথমে কাকরাইল মসজিদে অবস্থান করেন। এটা এখনো হয়। তখনো হতো। কিন্তু আরামের সাথে অবস্থানের জায়গা ছিল না সে সময়ের কাকরাইল মসজিদে। স্বল্প জায়গার জন্য ইবাদত করতে মুসল্লিদের অনেক কষ্ট হতো। অথচ দ্বীনের প্রচারকারীগণ আমাদের মধ্যে অনেক দামী। ইরশাদ হয়েছে, তোমাদেরকে শ্রেষ্ঠ উম্মত বানানো হয়েছে তোমরা সৎকাজের আদেশ করবে। অসৎ কাজে বাধা প্রদান করবে। কাকরাইল মসজিদের জায়গা সংকটের বিষয়টা বঙ্গবন্ধুর কানে যায়। তিনি কালক্ষেপণ না করে মসজিদের জন্য সুবিশাল জায়গা বরাদ্দ করেন এবং সাথে সাথে কাজ শুরু করে দেন। তারপর অনেক বড় মসজিদ নির্মাণ হয়। বাংলাদেশের মুসলিম জনতার আশা পূরণ করেন বঙ্গবন্ধু।২২

বিশ্ব ইজতেমার জন্য জায়গা বরাদ্দ

বিশ্ব ইজতেমা শব্দটি আমাদের কাছে অতি সুপরিচিত। আমাদের দেশের মাটিতে প্রতিবছর অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে ইজতেমা। এটা বিশ্বের আন্তর্জাতিক দ্বিতীয় ইসলামী সম্মেলন। এই সম্মেলন স্বাধীনতার আগ থেকে এদেশের মাটিতে হয়ে আসছে। দুঃখজনক ব্যাপার হলো এর নির্দিষ্ট কোন জায়গা ছিল না বললেই চলে। তাবলীগীদের সুবিধামতো একেক সময় একেক জায়গায় ইজতেমা করতেন। এদেশের মাটিতে ১৯৪০ সালে হযরত শামসুল হক ফরিদপুরী এবং মাওলানা আব্দুল আজিজ (র)-এর মাধ্যমে তাবলীগী দাওয়াত আসে। সর্বপ্রথম ১৯৪৬ সালে কাকরাইল মসজিদে বিশ্ব ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। তার দুই বছর বাদে ১৯৪৮ সালে চট্টগ্রাম হাজী ক্যাম্পে ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। তারপর ১৯৫৮ সালে নারায়ণগঞ্জ সিদ্ধিরগঞ্জে। তারপর ১৯৬৫ সালে টঙ্গীর পাড়ে। তারপর ১৯৬৬ সালে টঙ্গীর তুরাগ নদীর তীরে। তারপর থেকে ধারাবাহিক টঙ্গী ময়দান বিশ্ব ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। কিন্তু সেখানে জায়গা তেমন বেশী ছিলনা

বলে তাবলীগীদের অনেকটা কষ্ট হচ্ছিল। তারপর ১৬০ একর জায়গা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিশ্ব ইজতেমার জন্য বরাদ্দ করেন। বর্তমানে বিশ্ব ইজতেমায় প্রায় ৫০-৫৫ টি দেশ থেকে তাবলীগী ভাইয়েরা দিনে কাজের জন্য একত্রিত হন। সেখানে প্রায় ৩০ লাখ মানুষের আনাগোনা হয়।♦

তথ্যসূত্র

১. সূরা নিসা : ৫৯
২. মুসলিম শরিফ
৩. সূরা তাওবা, আয়াত : ২৫
৪. সুরা আরাফ, আয়াত : ৮৮
৫. সুরা ইবরাহিম, আয়াত : ১৩
৬. সূরা কাসাস, আয়াত : ৮৫
৭. সুনানে নাসায়ি, হাদিস : ৩১০৮
৮. সহিহ বুখারি, হাদিস : ১৮৮৯
৯. সহিহ বুখারি, হাদিস : ১৮৮৯
১০. জামিউল আসার, পৃষ্ঠা ২২১২
১১. সহিহ মুসলিম, হাদিস : ২২৭৭
১২. মুসলিম
১৩. দৈনিক কালের কণ্ঠ ১১/০৮/১৭
১৪. সূরা আরাফ, অয়াত ২৬-২৭
১৫. ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা জুলাই-সেপ্টেম্বর,পৃষ্ঠা–৯২
১৬. বুখারী হা.১৫২১
১৭. ইবনু মাজাহ হা.২৯০১
১৮. তিরমিযী হা. ৮২৮
১৯. মাসিক অগ্রপথিক আগস্ট ১৯৯৭
২০. ইসলাম প্রচারে বঙ্গবন্ধ পৃষ্টা ২৫
২১. দৈনিক ইনকিলাব ১৫/০৮/১৭
২২. মাসিক অগ্রপথিক আগস্ট ১৯৯৮ পৃষ্টা ১২৮

গণতন্ত্র ও মুক্তির প্রতীক ধানমন্ডি ৩২ নম্বর

শামস সাইদ

বাঙালি জাতির স্বাধীকার আন্দোলন, একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ ও সশস্ত্র সংগ্রাম, বিজয় অর্জন, স্বাধীনতা লাভ এবং স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয়, আধুনিক জাতি রাষ্ট্র গঠনের ইতিহাসে একটি অনবদ্য ঘটনা। আর এই সকল আন্দোলন ও ভূমিকার প্রধান চারণভূমি হিসেবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে একটি পরিবার। একটি বাড়ি। আর এ পরিবারের কর্তাব্যক্তি শুধু পারিবারিক গন্ডিতেই নয় সমগ্র দেশবাসীর প্রধান ব্যক্তিরূপে অভিহিত। তাই একাত্তরে বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশকে কেন্দ্র করে যেসব ঘটনা ঘটেছে সেগুলোর সবই স্পর্শ করেছে বঙ্গবন্ধু পরিবারকে। বঙ্গবন্ধুর ধানমন্ডি ৩২ নম্বর সড়কের বাড়িটিকে। আর বঙ্গবন্ধু পরিবারের যেকোন ঘটনাই রাজনীতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে সংশ্লিষ্ট। পাশাপাশি ঘটনার ঐতিহাসিক প্রবাহও অনস্বীকার্য। সেই সঙ্গে ইতিহাস হয়েছে বত্রিশ নম্বরের বাড়িটিও। এই বাড়িটি মুক্তি আন্দোলনের সুতিকাঘর। এটি আবেগাপ্লুত বাড়ি। এ বাড়ির সঙ্গে জড়িয়ে আছে গণতন্ত্রের আন্দোলন ও মুক্তির আন্দোলনের ইতিহাস। ৩২ নম্বর বললেই সারা দেশের মানুষ ও অনেক বিদেশিরাও মুহূর্তের মধ্যে বুঝে যায় কোন বাড়ির কথা বলা

হচ্ছে। এই বাড়িটা দেখলেই সবার ভেতর থেকে গাঢ় একটা বিষাদের তিক্ত নিঃশ্বাস বেরিয়ে আসে। বাড়িটি এত সুপরিচিত হওয়ার পেছনে রয়েছে একজন মানুষ, একটা দেশ, একটা রাত, একটা ট্রাজিডি, একটা ইতিহাস, একটা অধ্যায়ের সূচনা আবার একটা অধ্যায়ের সমাপ্তি। সবই যেন এই বাড়িটিকে ঘিরে।

এই সাদামাটা বাড়িটির কথা সকলেই জানে। কারণ, এখানে বাস করতেন জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। এটি শুধু বাড়ি নয়, এটি একটি জাতিরাষ্ট্র সৃষ্টির কেন্দ্রবিন্দু। এটা ইতিহাসের বাড়ি। যেখান থেকে বাঙালির স্বাধীনতার স্বপ্ন বীজ রুপিত হয়েছিল। ৩২ অবশ্য ধানমন্ডির একটি রাস্তার নম্বর। বাড়ির নম্বর ৬৭৭। নিকট অতীতে ধানমন্ডিতে রাস্তার নম্বর পুনর্বিন্যাস হলেও ঐতিহাসিক মর্যাদার কারণে সিটি করপোরেশন ৩২ নম্বর অপরিবর্তিত রেখেছে। পাকিস্তান আমলে আইউব খানের সামরিক শাসন থেকে স্বাধীন বাংলায় জিয়াউর রহমানের সামরিক আমল পর্যন্ত অনেক ঝড়ঝাপটা পেরুতে হয়েছে এ বাড়িটিকে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সারা জীবনই রাজনীতিতে মগ্ন ছিলেন। বাঙালি জাতির মুক্তির জন্য আন্দোলন করেছেন। এমনকি ঘর সংসারের খবরও তেমন একটা রাখতে পারতেন না। সংসার সামলাতেন বঙ্গবন্ধুর সহধর্মিণী বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিব। ঢাকায় বঙ্গবন্ধু পরিবারের মাথাগোঁজার ঠাঁই ছিল না। কয়েক দফায় সরকারের মন্ত্রী থাকা অবস্থায় সরকারি বাসভবনে থাকতেন বঙ্গবন্ধু পরিবার। ১৯৫৪ সাল বঙ্গবন্ধু প্রথমবারের মতো যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভার মন্ত্রী হন। কিন্তু সে সরকার বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। ১৯৫৬ সালে আওয়ামীলীগ কংগ্রেস, তফসিলি ফেডারেশন ও গণতন্ত্রী পার্টি সরকার গঠন করলে সে সরকারের প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন আতাউর রহমান খান। আর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন সেই মন্ত্রীসভার বাণিজ্য, শ্রম, শিল্প ও দুনীর্তি দমন মন্ত্রী। মন্ত্রী হিসাবে বঙ্গবন্ধু সপরিবারে থাকতেন আব্দুল গণি রোডের ১৫ নম্বর বাড়িতে। বঙ্গবন্ধুর পিএস ছিলেন নুরুজ্জামান। সেই সময় পিডব্লিউডি থেকে বিভিন্ন শ্রেণি পেশার

ব্যক্তিদের প্লট বরাদ্ধ দেয়া হচ্ছিল। নুরুজ্জামান পিডব্লিওডি থেকে একটি আবেদন ফরম সংগ্রহ করে বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিবের কাছে নিয়ে আসেন। ফরমটি যথাযথভাবে পূরণ করে আবেদন করেন।

১৯৫৭ সালের শুরুতে বেগম মুজিবের নামে ১ বিঘার একটি প্লট বরাদ্ধ দেয়া হয়। যার মূল্য ৬ হাজার টাকা। নিয়ম মোতাবেক ২ হাজার টাকা পরিশোধ করার পর বাকি থাকে ৪ হাজার টাকা। বাকি ৪ হাজার টাকা কিস্তিতে পরিশোধ করতে হবে। সেই বছরই শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশ আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন এবং মন্ত্রীত্ব ছেড়ে দেন। ১৯৫৮ সালে বঙ্গবন্ধু টি-বোর্ডের চেয়ারম্যান থাকা অবস্থায় সেগুন বাগিচায় একটি বাসা তাঁর নামে বরাদ্ধ দেয়া হয়। কিন্তু ১৯৫৮ সালে আইয়ুব খান মার্শাল ল জারি করে এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতার করে। বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতারের পর ১২ অক্টোবর বঙ্গবন্ধুর পরিবারকে সেগুন বাগিচার বাড়িটি তিন দিনের মধ্যে ছেড়ে দিতে বলা হয়। ১৯৫৮ সালের ১৫ অক্টোবর বাড়িটি ছেড়ে দিতে বাধ্য করা হয়। টি বোর্ড থেকে প্রাপ্ত বঙ্গবন্ধুর জিপটি এবং বাড়ির কিস্তি পরিশোধের জন্য রাখা ২ হাজার টাকা ও বেশকিছু মালামাল নিতে দেয় না। এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়ার পর বেগম মুজিব তাঁর সন্তানদের নিয়ে এক অনিশ্চিত অবস্থার মধ্যে পড়েন। কেউ বাড়ি ভাড়া দিতে চাচ্ছে না। শেষ পর্যন্ত চেষ্টা তদবিরের পর সিদ্ধেশ্বরী বয়েজ স্কুলের মাঠের পাশে মাসিক ২ শত টাকায় একটি ভাড়া বাড়িতে ওঠেন। কিছুদিনের মধ্যেই জানাজানি হয়ে গেল শেখ মুজিবের পরিবার এই বাড়িতে থাকে। বাড়ির মালিক বেগম মুজিবকে বাড়ি ছেড়ে দেয়ার নোটিশ দেন। বাধ্য হয়ে এ বাড়ি ছেড়ে তিনি সন্তান নিয়ে আবার এসে ওঠেন সেগুনবাগিচার একটি ভাড়া বাসার দোতলায়। ১৯৬০ সালের ১ অক্টোবর বঙ্গবন্ধু জেল থেকে মুক্ত হলেন। পরে আলফা ইন্স্যুরেন্স কোম্পানীতে কন্ট্রোলার অব এজেন্সিস পদে চাকরি নিলেন। তখন বেগম মুজিব বুঝেছিলেন, যে কোনোভাবেই হোক তাঁকে মাথা গোঁজার ঠাঁই করতে হবে। বঙ্গবন্ধু মুক্তি পাওয়ার পরই বেগম মুজিবের নামে বরাদ্ধ পাওয়া ধানমন্ডিতে বাড়ি নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করলেন। ১৯৬০-৬১ সাল থেকেই ধার-কর্জ ও বন্ধু-বান্ধবের সহযোগিতা এবং হাউস বিল্ডিং ফাইনান্স কর্পোরেশন থেকে ঋণ নিয়ে ধানমন্ডির ৩২ নম্বরের এই বাড়িটির নির্মাণ কাজ শুরু হয়।

বঙ্গবন্ধুর এ বাড়িটির নির্মাণকাজ তদারকী করেছিলেন তৎকালীন পিডব্লিউডির নির্বাহী প্রকৌশলী ও পরবর্তীকালে পূর্ত সচিব মাইনুল ইসলাম। এ বাড়ি নির্মাণের কাজে আর্থিকভাবে সহযোগিতা করছিলেন বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক ও দাপ্তরিক সহকর্মীরা। সব থেকে বেশি সহযোগিতা করেছেন বঙ্গবন্ধুর একনিষ্ঠ সহকর্মী চাঁদপুরের হাজিগঞ্জের নূরুল ইসলাম। ‘ক্রস ওয়ার্ড’ লটারি খেলতেন

তিনি। আলফা ইন্স্যুরেন্স কোম্পানীর একজন কর্মকর্তা হিসাবে বঙ্গবন্ধুর সাথে ছিল তার আত্মিক ও পারিবারিক সম্পর্ক। অফিসে ক্রস ওয়ার্ড লটারি খেলা সবার জন্য ছিল বাধ্যতামূলক। একদিন লটারীতে ব্যবহার করেছিলেন তিনি শেখ রেহানার নাম। সেইদিনই পেয়ে যান ছয় হাজার টাকা। এই টাকা তিনি গচ্ছিত রাখেন বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিবের কাছে। বাড়ি নির্মাণ কাজে টাকার সংকট দেখা দিলে নূরুল ইসলাম এই গচ্ছিত টাকা কাজে লাগানো জন্য অনুরোধ করেন। তাঁর অনুরোধের প্রেক্ষিতে এ টাকা ঋণ হিসাবে গ্রহণ করেন বেগম মুজিব।

বাড়ি নির্মাণকালীন কেয়ার টেকার ছিলেন টুঙ্গিপাড়ার আরজ আলী। বঙ্গবন্ধুর বাড়ির সামনের ঝাউগাছটি এনে দিয়েছিলেন, বদরুন্নেছা আহমেদের স্বামী নুরুদ্দিন আহমেদ। বাড়ির জানালার গ্রীল সরবরাহ করেছিলেন তৎকালীন কেন্দ্রীয় আওয়ামীলীগ নেতা রংপুরের মতিউর রহমান। কোনোমতে বাড়িটি নির্মাণ কাজ শেষ করে ১৯৬১ সালের ১ অক্টোবর পরিবার পরিজন নিয়ে বঙ্গবন্ধু এ বাড়িতে ওঠেন। একতলা এ বাড়িটিতে তখন ছিল দুইটি বেডরুম। এক রুমে থাকতেন বঙ্গবন্ধু ও বেগম মুজিব। অন্য রুমে থাকতেন শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা। তার পাশে ছিল আর একটি কক্ষ। সেখানে থাকতেন শেখ কামাল ও শেখ জামাল। বাড়িতে ঢুকতেই ছিল একটি ছোট রুম এ রুমটিকে ড্রয়িং রুম হিসাবে ব্যবহার করা হতো। এই রুমের আসবাব বলতে ছিল একসেট বেতের সোফা।

বঙ্গবন্ধুর বাড়িতে যে টেলিফোনটি প্রথম সংযোগ দেয়া হয় তার নম্বর ছিল ২৫৬১। টেলিফোন নিয়েও বেশ মজার গল্প আছে। আইয়ুব খানের সামরিক গোয়েন্দা সংস্থা প্রায়ই এ টেলিফোনটিতে আড়ি পাততো। তাই, শেখ ফজলুল হক মনি বঙ্গবন্ধুর সাথে কথা বলতে চাইলে নিজের নাম গোপন করে 'বালিওয়ালা' বলে নিজের পরিচয় দিতেন। সিরাজুল আলম খান নিজের পরিচয় দিতেন 'ইটাওয়ালা' বলে। যেহেতু বঙ্গবন্ধুর ৩২ নম্বরের বাড়িটি তখন তৈরি হচ্ছিল তাই পাক সামরিক জান্তাকেও এ পরিচয়টি বিশ্বাস করতে হয়েছিল।

একজন স্বল্প আয়ের মানুষ যেভাবে তিলে তিলে নিজের মাথা গোজার ঠাঁই তৈরি করেন, তেমনিভাবে বঙ্গবন্ধু ও তাঁর সহধর্মিণী বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিব ৩২ নম্বরের এ বাড়িটি গড়ে তুলেছিলেন। বঙ্গবন্ধুর এ বাড়িটি একটা সময়ে এসে হয়ে যায় বাঙালির আশা-আকাঙ্ক্ষা, স্বাধীনতা ও স্বপ্নের ঠিকানা।

১৯৬২ সালে আইয়ুব খানের সামরিক শাসন শুরু হয়। বাঙালির মনের মধ্যে দানা বাঁধতে থাকা অসন্তোষ। বাড়তে থাকে অপশাসনের হাত থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা। শেখ মুজিবুর রহমান দিন দিন গণমানুষের নেতা হয়ে উঠলেন। আর

৩২ নম্বরের এই বাড়িটি হয়ে উঠল মুক্তির প্রতীক। শেখ মুজিবুর রহমানের মতো ৩২ নম্বরের এই বাড়িও গণমানুষের ভরসা ও আশ্রয়স্থল হয়ে উঠতে থাকে। গণমানুষের এই ভরসার প্রতিদান দিয়েছেন বঙ্গবন্ধু। ১৯৬২ সালের আইয়ুববিরোধী আন্দোলন, '৬৬ সালের ছয় দফা আন্দোলন, '৭০ সালের সাধারণ নির্বাচন, '৭১ সালের শুরুতে অসহযোগ আন্দোলন– এসব গুরুত্বপূর্ণ সময়ে বঙ্গবন্ধু পরিকল্পনা করা, নেতা-কর্মীদের সঙ্গে মতবিনিময় সবই করেছেন এই ৩২ নম্বর বাড়িতে। '৭১-এর উত্তাল দিনগুলোয় দেশি-বিদেশি সাংবাদিকরাও জাতির জনকের সঙ্গে দেখা করার জন্য এখানে ভিড় করেছিলেন। এ ছাড়া ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণের রূপরেখাও এ বাড়িতেই তৈরি করেছিলেন শেখ মুজিব। ২৩ মার্চ এই বাড়িতেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বাসভবনে স্বাধীন বাংলার পতাকা উত্তোলন করা হয়।

১৯৭১ সালে আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের প্রাক্কালে এই বাড়িটি হয়ে যায় ইতিহাসের বাড়ি। এই বাড়ি থেকেই বঙ্গবন্ধু বাঙালির স্বাধীনতা ও মুক্তি সংগ্রামের বীজ রোপণ করে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন সাড়ে সাত কোটি বাঙালির প্রাণে প্রাণে। 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবাবের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম' ঐতিহাসিক ৭ই মার্চে রেসকোর্স ময়দানে ভুবনখ্যাত ভাষণের রাতেই ৩২ নম্বরের ঐতিহাসিক বাড়িতে খাওয়ার সময় বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন,'আমার যা বলার ছিলো আজকের জনসভায় তা বলে ফেলেছি। সরকার এখন আমাকে যে কোনো মুহূর্তে গ্রেপ্তার বা হত্যা করতে পারে। সেজন্য আজ থেকে তোমরা প্রতিদিন দু'বেলা আমার সঙ্গে একত্রে খাবে'। শেখ হাসিনা, শেখ কামাল, শেখ জামাল, শেখ রেহানা, শেখ রাসেল, শেখ শহীদ, ড. এম এ ওয়াজেদ মিয়া এবং বেগম মুজিবকে উদ্দেশ্য করে এমনটিই বলেছিলেন।

২৫ তারিখ দিবাগত রাতে বঙ্গবন্ধু নেতা-কর্মীদের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা ও নির্দেশ দানে ব্যস্ত থাকায় ৭ তারিখ থেকে মেনে চলা নিয়মের ব্যত্যয় ঘটে। অন্যরা সকলেই রাতের খাবার শেষ করলেও বেগম মুজিব স্বামীর জন্য অপেক্ষায় থাকেন। রাত ন'টার দিকে সবার খাওয়া শেষে শেখ কামাল চলে গেলেন গোপন আস্তানায়। রাত ১১ টার পরেও বঙ্গবন্ধু খেতে না আসায় শেখ হাসিনা নীচতলায় নামতে চাইলেন, সিঁড়িতেই বাবা মেয়েকে জড়িয়ে ধরে আবেগাপ্লুত হয়ে বলে উঠেন 'মা তোকে আমি সারাদিন দেখিনি'।

এরপরে রাত ১১টা থেকে ১২টার মধ্যেই কয়েকজন বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে আসেন। বিভিন্নজনের কাছ থেকে গুরুত্বপূর্ণ খবর পেয়ে বঙ্গবন্ধু সিদ্ধান্ত নেন বাড়ি ত্যাগ করবেন না তিনি। পালিয়েও যাবেন না। অপরাপর সকল নেতা-

কর্মীদের বিভিন্ন নির্দেশ দিলেন। ওয়াজেদ মিয়াকে ডেকে বলনে, হাসিনা, রেহানা ও জেলীকে নিয়ে তার নতুন ভাড়া বাড়িতে চলে যেতে।

৭ তারিখের পর থেকে একে একে ঘটতে থাকে সকল না দেখা ঘটনা। চলতে থাকে অসহযোগ আন্দোলন। রাজনীতির আড়ালের রাজনীতির কূটকৌশল আলোচনা পর্ব। সাড়ে সাত কোটি বাঙালি তাদের ধৈর্যের সকল পরীক্ষা দিয়েই বিদ্রোহী সত্তায় অবতীর্ণ হয়। অসহযোগ আন্দোলন শুরুর প্রথম দিকেই বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে ও তাগাদা দেওয়ায় ওয়াজেদ মিয়া আলাদা বাড়ি ভাড়া নেন হাতিরপুলে বিজ্ঞানী ড. আব্দুল্লাহ আল মুতী শরফুদ্দিনের শ্বশুর খান বাহাদুর আবদুল হাকিম সাহেবের ১২ নং ফ্রি স্কুল স্ট্রিটের একই কম্পাউন্ডের তিনটি বাড়ির মধ্যকার একটি বাড়ির দোতলা। ঐ সময়ে শেখ হাসিনা ছিলেন চার মাসের অন্তঃসত্ত্বা এবং দেশের অবস্থা ক্রমেই ঘোলাটে পরিস্থিতির দিকে ধাবিত হওয়ায় তাদের নিরাপত্তার কথা ভেবেই বঙ্গবন্ধু এমন নির্দেশ দিয়েছিলেন। সেই মতো ১৪ মার্চ কিছু আসবাবপত্রও সেই বাসায় নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু ১৫ মার্চে ড. ওয়াজেদ মিয়া ও শেখ হাসিনা সেই বাসায় গিয়ে নিঃসঙ্গতা বোধ করায় তৎক্ষণাৎ বাসা ছেড়ে দিয়ে ঐতিহাসিক ৩২ নম্বরে ফিরে আসেন। ১৬ মার্চ ধানমন্ডি (পুরাতন) ১৫ নম্বরস্থ (নতুন ৮/এ-১৭৭) বাড়িটির নীচতলা ভাড়া নেন এবং ১৭ মার্চ যথারীতি আসবাবপত্র রেখে আসা হয়।

গ্রেফতার, নির্যাতন ও আত্মগোপনের মধ্যদিয়ে ৩২ নম্বরের ঐতিহাসিক বাড়ির সঙ্গে বিচ্ছিন্নতার শুরু হয়। ড. এম এ ওয়াজেদ মিয়া নানারকম শংকা ও থমথমে পরিস্থিতির মধ্যেই ধানমন্ডির নতুন ভাড়া বাড়িতে পৌঁছার মিনিট বিশেকের মধ্যেই হাসিনা, রেহানা, জেলী এবং বঙ্গবন্ধুর বাড়িতে দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন কাজকর্মের দেখাশুনা করা ওয়াহিদুর রহমান ওরফে পাগলাসহ বঙ্গবন্ধুর গাড়িতেই পৌঁছান। কিছুক্ষণের মধ্যেই চারদিকে গোলাগুলি ও কামানের আওয়াজ শুরু। অজানা আশংকা নিয়েই পাড়ি দেন পুরো রাত হারিকেন জ্বালিয়ে। আগের রাত থেকে সন্ধ্যাবধি ঘর থেকে বের হতে না পারায় বাইরের কোনো খবরই সংগ্রহ করতে পারেননি। ২৬ তারিখ সন্ধ্যায় শেখ কামালের এক বন্ধু গোপনে অনেকগুলো বাড়ির দেওয়াল টপকে গিয়ে খবর দেন, গতরাত আনুমানিক ১টার দিকে পাকিস্তানি আর্মী বঙ্গবন্ধুর বাড়িতে সশস্ত্র হামলা চালিয়ে বঙ্গবন্ধুকে গ্রেপ্তার করেছে।

বেগম মুজিব, জামাল ও রাসেল বিভীষিকাময় সেই রাতের পর ২৭ তারিখ ভোরের আগে কোন এক সময়ে ড. এ কে এম মোশাররফ হোসেনের বাসায় আশ্রয় নেন। ২৭ তারিখ সকালে কারফিউ শিথিল হলে ড. ওয়াজেদ, শেখ

হাসিনা ও জেলীকে নিয়ে বেগম মুজিব, জামাল ও রাসেলকে খুঁজতে বেরিয়ে দেখেন বঙ্গবন্ধুর বাড়িটি শ্মশান ভূমিতে পরিণত হয়েছে। আর্মী পাহারা দিচ্ছে।

১৬ই ডিসেম্বর ১৯৭১। বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করে। বাংলার আপামর জনসাধারণ স্বাধীনতার স্বাদ লাভ করলেও তখন পর্যন্ত ধানমন্ডির **১৮** নম্বর সড়কের এক বাড়িতে অন্তরীণ জাতির পিতার পরিবার। পাকিস্তানী সেনাবাহিনী রেসকোর্স ময়দানে মিত্রবাহিনী ও মুক্তিবাহিনীর যৌথকমান্ডের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে ঠিকই, কিন্তু **১৮** নম্বর সড়কের এক বাড়ি যেন তখনও স্বাধীন বাংলাদেশের বাইরে! পাকিস্তানি সৈন্যরা ঘিরে রেখেছে সেই বাড়ি। এই বাড়িতেই অবস্থান করেছিলেন বাংলাদেশের আপামর জনসাধারণকে স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখানো বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পরিবার। বাইরে শোনা যাচ্ছে জনতার আনন্দধ্বনি, কিন্তু এত কাছ থেকেও বঙ্গবন্ধু পরিবারের কাছে স্বাধীনতা ছিল অনাস্বাদিত এক বিরল নাম!

অবশেষে **১৭** ই ডিসেম্বর **১৯৭১**, বঙ্গবন্ধুর পরিবারের সদস্যদের উদ্ধার করতে ভারতীয় সেনাবাহিনীর **১৪** গার্ডস ইউনিট কোম্পানী কমান্ডার মেজর অশোক কুমার তারা, মাত্র তিনজন সৈন্য নিয়ে এ অভিযান পরিচালনা করেন। মেজর তারা সেই বাড়ির সন্নিকটে পৌঁছার পরই বাড়ির ভেতরে অবস্থান নেয়া পাকিবাহিনীর এক সদস্য তাঁকে হুমকি দেয়, সে যদি সরে না যায়, তাহলে তাঁকে গুলি করা হবে। উল্লেখ্য সেই বাড়ির বাইরে পৌঁছিয়েই মেজর তারা দেখতে পান, বুলেটে ঝাঁঝড়া হয়ে যাওয়া একটি গাড়ি পড়ে আছে, ভেতরে একটি মৃতদেহ। গুলির হুমকি শুনে ঘাবড়ে না গিয়ে উল্টো নিজের হাতে থাকা হাতিয়ার এক সৈন্যর কাছে রেখে নিরস্ত্র অবস্থায় বাড়ির দিকে এগিয়ে যান। বাড়ির ভেতর থেকে হুমকি আসে, মেশিনগানের নল তাক করা আছে, সে যেন আর সামনে না আগায়। মেজর তারা ভেতরের সৈনিকদের সাথে কথা চালিয়ে যেতে থাকেন। এরমধ্যেই এক যুবক পাকসেনা মেজর তারার বুকে রাইফেলের বেয়নেট দিয়ে খোঁচা দিতে থাকে। এভাবে কেটে যায় প্রায় দশ মিনিট। পাক সুবেদার, মেজর তারার কাছে এক ঘন্টা সময় চাইলো। মেজর তারা সেই অনুরোধে রাজি হয়ে ফিরে যেতে উদ্যত হলেই, মমিনুল হক খোকা মেজর তারাকে ডেকে বলেন, যে মেজর তারা পাকিবাহিনীকে সময় দিলেই তারা বঙ্গবন্ধুর পরিবারকে নিশ্চিহ্ন করে দেবে। এ কথা শুনেই মেজর তারা পাকিবাহিনীর সদস্যদের নিরস্ত্র করেন এবং তাদের সাধারণ পোশাক পড়িয়ে তাঁর সাথে নিয়ে যান, তার আগে নিশ্চিত করেন যে, বঙ্গবন্ধুর পরিবারের সকল সদস্য নিরাপদে আছেন। শেষ দুইদিন কোনো খাবারও ছিল না বঙ্গবন্ধুর পরিবারের কাছে। শুধু বিস্কিট খেয়ে কাটিয়েছিলেন তারা স্বাধীন দেশে দুইদিন!

৩২ নম্বর বাড়িটি পাকিস্তানী আর্মিরা ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতে এবং মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে বিপুল ক্ষয়ক্ষতি করে। বাড়িটি মেরামত করে বাসোপযোগী করতে প্রচুর টাকা ও সময় দরকার হবে এসব ভেবে বেগম মুজিব ধানমন্ডির ১৮ নম্বর রোডের ২৬ নম্বর বাড়িটি ভাড়া নেন। এখানেই পরিবারের সদস্যদের নিয়ে অবস্থান করেন।

১০ জানুয়ারি ১৯৭২। ইতিহাসে এক স্মরণীয় দিন। এই দিনটি ছিল বাঙালির কাছে ১৬ ডিসেম্বর চূড়ান্ত বিজয়ের চেয়েও কাঙ্ক্ষিত ও আনন্দদায়ক। ১৯৭২ সালের এই দিনটিতে রোমাঞ্চ লেগেছিল বাংলাদেশের 'দিকে দিকে, ঘাসে ঘাসে'। সে এক 'মহাজন্মের লগ্নই' ছিল বাঙালির। সেদিন ভেঙে গিয়েছিল 'অমারাত্রির দুর্গতোরণ'। বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রগতিশীল ধারার প্রবক্তা বাঙালির স্বাধীনতার মহানায়ক, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বদেশের মাটিতে পা রাখলেন। রেসকোর্স ময়দানের জনসভা শেষে বিকেল সাড়ে ছয়টায় ধানমন্ডির ১৮ নম্বর রোডস্থ ২৩ নম্বর দোতলা বাড়িটিতে ওঠেন। পরে ঐ রাতেই বেগম মুজিবের ভাড়া নেয়া ২৬ নম্বর বাড়িটিতে ওঠেন।

বঙ্গবন্ধু দেশের প্রেসিডেন্ট হয়েও সরকারি বাসভবনে যাননি। ৩২ নম্বরের ওই বাড়িটি মেরামত করে আবার ওখানেই উঠলেন। দীর্ঘদিন পর হঠাৎ এক সন্ধ্যায় বাড়িটিতে আলো জ্বলল। ঘাঁপটি মারা আঁধার জানালা দিয়ে পালাল। পাখিরা গান গেয়ে উঠল। আজ সবার মনে আনন্দের বন্যা বয়ে যাচ্ছে। গাছগুলো সজিব সতেজ হয়ে উঠল। সবুজ পাতার ফাঁকে ফাঁকে ফুল ফুটল। মানুষের আনাগোনায় বাড়িটা প্রাণ ফিরে পেয়েছে। সেই খোলা বারান্দায় বসে বঙ্গবন্ধু পাইপ টানছেন। স্বাধীন দেশের মুক্ত হাওয়া তাঁর মনে দোলা দিচ্ছে। আবার প্রশ্ন উঠলো এ বাড়িটা আপনার জন্য নিরাপদ না। এ বাড়ি ছেড়ে অন্য কোথাও ওঠেন। বঙ্গবন্ধু এই বাড়িতেই আছেন। এ বাড়ির মাটি, গাছপালা, পশুপাখি, মুক্ত বাতাস সব কিছু আপন মনে হচ্ছে। ওরা সবাই ইতিহাসের সাক্ষী। সব মিলিয়ে তাঁর একটা আপন জগত এখানে।

বঙ্গবন্ধু বললেন, এ বাড়িতে আমার ছেলে মেয়েদের শৈশব কৈশোর কেটেছে। এখানে বসে আমি স্বাধীনতা আন্দোলনের সূচনা করেছি। এই বাড়িটি স্বাধীন বাংলার প্রথম অফিস, এটা ছেড়ে আমি কোথায় যাব। এখন আমার কিসের ভয়। এখন আমরা শত্রুমুক্ত।

সেদিন অনেক রাতে সকলকে বিদায় দিয়ে বিছানায় গেলেন বঙ্গবন্ধু। একে একে সবগুলো লাইট নিভে গেল। চারদিক থেকে ঘুমেরা এসে তাকে জড়িয়ে ধরল। রাতটা ছিল পঁচাত্তরের ১৫ আগস্ট। ইতিহাসের কলঙ্করাত। বাঙালির পিতাহারা রাত। এই রাতে স্বাধীনতা বিরোধী অপশক্তি বঙ্গবন্ধুর বাসভবনে আক্রমণ করল। ধানমন্ডির এই বাড়িটি আক্রান্ত হওয়ার আগেই রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তার আত্মীয় ও মন্ত্রিসভার সদস্য আবদুর রব সেরনিয়াবাতের হত্যাকাণ্ডের খবর পান। যে ঘরে বঙ্গবন্ধু ছিলেন, তার বাইরের বারান্দায় ঘুমিয়েছিলেন মো. সেলিম (আব্দুল) ও আব্দুর রহমান শেখ (রমা)। ওপর থেকেই বঙ্গবন্ধু নিচতলায় তার ব্যক্তিগত সহকারী এ এফ এম মহিতুল ইসলামকে টেলিফোন করে বলেন, "সেরনিয়াবাতের বাসায় দুষ্কৃতকারীরা আক্রমণ করেছে। জলদি পুলিশ কন্ট্রোল রুমে ফোন লাগা।" পুলিশ কন্ট্রোল রুমে ফোন করে কোনো সাড়া শব্দ না পেয়ে মহিতুল গণভবন (তৎকালীন রাষ্ট্রপতির কার্যালয়) এক্সচেঞ্জে চেষ্টা করতে থাকেন।

ভোর সাড়ে ৫টার দিকে বঙ্গবন্ধুর বাড়ির রক্ষীরা বিউগল বাজিয়ে জাতীয় পতাকা উত্তোলন শুরু করা মাত্রই বাড়িটি লক্ষ্য করে দক্ষিণ দিক থেকে সরাসরি আক্রমণ শুরু হয়। একটু পরেই বঙ্গবন্ধু তাঁর ঘরের দরজা খুলে বারান্দায় বেরিয়ে আসেন। ঘুম থেকে ওঠে গৃহকর্মী আব্দুল আর রমা। বেগম মুজিবের কথায় রমা নিচে নেমে প্রধান ফটকের বাইরে এসে দেখেন সেনাবাহিনীর কিছু সদস্য গুলি করতে করতে বঙ্গবন্ধুর বাড়ির দিকে এগুচ্ছে।

রমা বাড়ির ভেতরে ফিরে দেখেন, লুঙ্গি আর গেঞ্জি পরা অবস্থাতেই বঙ্গবন্ধু নিচতলায় নামছেন। দোতলায় গিয়ে দেখেন, বেগম মুজিব আতঙ্কিত অবস্থায় ছোটাছুটি করছেন। রমা আর দোতলায় দাঁড়িয়ে না থেকে তিন তলায় চলে যান এবং বঙ্গবন্ধুর বড়ো ছেলে শেখ কামাল ও তাঁর স্ত্রী সুলতানা কামালকে ঘুম থেকে

তোলেন। ঘটনা শুনে শার্ট-প্যান্ট পড়ে নিচতলায় নামেন শেখ কামাল। সুলতানা কামাল আসেন দোতলায়।

রমা দোতালায় শেখ জামাল ও তার স্ত্রীকেও ঘুম থেকে তোলেন। জামা-কাপড় পরে শেখ জামাল তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে দোতলায় বেগম মুজিবের কক্ষে যান।

ওদিকে গোলাগুলির মধ্যে অভ্যর্থনা কক্ষে বঙ্গবন্ধুর সামনেই বিভিন্ন জায়গায় ফোন করতে থাকেন মহিতুল। পুলিশ কন্ট্রোল রুম ও গণভবন এক্সচেঞ্জে চেষ্টার এক পর্যায়ে রিসিভার নিয়ে বঙ্গবন্ধু নিজেই বলেন, 'আমি প্রেসিডেন্ট শেখ মুজিব বলছি ...।' বঙ্গবন্ধু তার কথা শেষ করতে পারেননি।

একঝাঁক গুলি জানালার কাচ ভেঙে অফিসের দেয়ালে লাগে। কাচের এক টুকরায় মহিতুলের ডান হাতের কনুই জখম হয়। ওই জানালা দিয়ে গুলি আসতেই থাকে। বঙ্গবন্ধু টেবিলের পাশে শুয়ে পড়েন এবং মহিতুলের হাত ধরে কাছে টেনে শুইয়ে দেন। এর মধ্যেই গৃহকর্মী আব্দুলকে দিয়ে বঙ্গবন্ধুর কাছে তাঁর পাঞ্জাবি ও চশমা পাঠিয়ে দেন বেগম মুজিব। কিছুক্ষণ পর গুলিবর্ষণ থেমে গেলে বঙ্গবন্ধু উঠে দাঁড়িয়ে আব্দুলের হাত থেকে পাঞ্জাবি আর চশমা নিয়ে পরেন। নিচতলার এই ঘর থেকে বারান্দায় বের হয়ে বঙ্গবন্ধু পাহারায় থাকা সেনা ও পুলিশ সদস্যদের বলেন, 'এত গুলি হচ্ছে, তোমরা কী করছো?' এ কথা বলেই বঙ্গবন্ধু ওপরে চলে যান।

বঙ্গবন্ধু উপরে উঠতে না উঠতেই শেখ কামাল নিচে নেমে বারান্দায় দাঁড়িয়ে বলেন, 'আর্মি আর পুলিশ ভাইয়েরা, আপনারা আমার সঙ্গে আসেন।' এ সময় শেখ কামালের পেছনে গিয়ে দাঁড়ান মহিতুল ইসলাম ও পুলিশের ডিভিশনাল সুপারিনটেনডেন্ট (ডিএসপি) নুরুল ইসলাম খান।

ঠিক তখনই মেজর নূর, মেজর মহিউদ্দিন (ল্যান্সার) এবং ক্যাপ্টেন বজলুল হুদা সৈন্যদের নিয়ে বঙ্গবন্ধুর বাড়িতে ঢোকে। গেটের ভেতর ঢুকেই তারা 'হ্যান্ডস্ আপ' বলে চীৎকার করতে থাকে। মহিতুল ইসলামকে টেনে ঘরের মধ্যে নিয়ে যান নুরুল ইসলাম খান। কোনো কথা না বলেই শেখ কামালের পায়ে গুলি করে বজলুল হুদা। নিজেকে বাঁচাতে লাফ দিয়ে ঘরের মধ্যে গিয়ে পড়েন শেখ কামাল। মহিতুলকে বলতে থাকেন, 'আমি শেখ মুজিবের ছেলে শেখ কামাল। আপনি ওদেরকে বলেন।' মহিতুল ঘাতকদের বলেন, 'উনি শেখ মুজিবের ছেলে শেখ কামাল।'

এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে শেখ কামালকে লক্ষ্য করে বজলুল হুদা তার হাতের স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র দিয়ে ব্রাশফায়ার করে। সঙ্গে সঙ্গে মারা যান শেখ কামাল। এর মধ্যে একটা গুলি মহিতুলের হাঁটুতে আরেকটা নুরুল ইসলামের পায়ে লাগে।

এ অবস্থাতেই মহিতুলকে টেনে নুরুল ইসলাম তার কক্ষে নিয়ে যান। সেখানে তারা দেখেন, পুলিশের বিশেষ শাখার এক সদস্য দাঁড়িয়ে ভয়ে কাঁপছেন। অস্ত্রটা তার পায়ের কাছে পড়ে আছে। মুহূর্তের মধ্যে ওই ঘরে ঢুকে বজলুল হুদা সবাইকে বাইরে গিয়ে দাঁড়ানোর আদেশ দেয়। নিচে কী হচ্ছে তার কিছুটা আঁচ করতে পেরেছিলেন বঙ্গবন্ধু। তিনি দোতলায় তার ঘরের দরজা বন্ধ করে বিভিন্ন জায়গায় ফোন করতে থাকেন। এক পর্যায়ে ফোনে তার সামরিক সচিব কর্নেল জামিলউদ্দিনকে পান। তিনি তাকে বলেন, 'জামিল, তুমি তাড়াতাড়ি আসো। আর্মির লোকরা আমার বাসা অ্যাটাক করেছে। সফিউল্লাহকে ফোর্স পাঠাতে বলো।'

তৎকালীন সেনাপ্রধান জেনারেল সফিউল্লাহকেও ফোন করেন বঙ্গবন্ধু। বলেন, 'সফিউল্লাহ তোমার ফোর্স আমার বাড়ি অ্যাটাক করেছে, কামালকে (শেখ কামাল) বোধ হয় মেরে ফেলেছে। তুমি জলদি ফোর্স পাঠাও।'

জবাবে সফিউল্লাহ বলেন, 'আই অ্যাম ডুয়িং সামথিং। ক্যান ইউ গেট আউট অফ দ্য হাউজ?'

কর্নেল জামিল তার ব্যক্তিগত লাল গাড়িটি নিয়ে বঙ্গবন্ধুর বাসার উদ্দেশে রওনা হন। সঙ্গে ছিলেন নিজের গাড়িচালক আয়েনউদ্দিন মোল্লা। কিন্তু, পথেই সোবহানবাগ মসজিদের কাছে তাকে গুলি করে হত্যা করে ঘাতকরা। পালিয়ে বেঁচে যান আয়েনউদ্দিন।

বঙ্গবন্ধুর বাড়ির গেটের সামনে মহিতুল, নুরুল ইসলাম, আব্দুল মতিন, পুলিশের বিশেষ শাখার সদস্যসহ অন্য সদস্যদের সারি করে দাঁড় করানো হয়। এর মধ্যে ঘাতকদের একজন পুলিশের বিশেষ শাখার সদস্যকে গুলি করলে গুলিবিদ্ধ হয়ে তিনি পড়ে যান।

এরপর ঘাতকরা গুলি করতে করতে উপরে চলে যায়। তারা শেখ জামালের ঘরের বাথরুমে আশ্রয় নেওয়া গৃহকর্মী আব্দুলকে গুলি করে। হাতে ও পেটে গুলিবিদ্ধ অবস্থাতে তিনি সিঁড়ির পাশে গিয়ে হেলান দিয়ে বসে থাকেন।

বঙ্গবন্ধুর ঘরে তিনি ছাড়াও ছিলেন বেগম মুজিব, শেখ জামাল, শেখ রাসেল, সুলতানা কামাল, রোজী জামাল। ঘাতকরা বঙ্গবন্ধুর ঘরের বাইরে অবস্থান নেয়। গোলাগুলি থামলে বঙ্গবন্ধু দরজা খুলে বারান্দায় বেরিয়ে আসলেই ঘাতকরা তাকে ঘিরে ধরে। মেজর মহিউদ্দিন ও তার সঙ্গের সৈন্যরা বঙ্গবন্ধুকে নিচে নিয়ে যেতে থাকে। ঘাতকদের উদ্দেশ্যে বঙ্গবন্ধু বলেন, 'তোরা কী চাস? কোথায় নিয়ে যাবি আমাকে?'

বঙ্গবন্ধুর ব্যক্তিত্বের কাছে মহিউদ্দিন ঘাবড়ে যায়। বঙ্গবন্ধু বলেন, 'তোরা আমাকে কোথায় নিয়ে যাবি, কী করবি- বেয়াদবি করছিস কেন?' এ সময়

নিচতলা ও দোতলায় সিঁড়ির মাঝামাঝি অবস্থান নেয় বজলুল হুদা ও নূর। বঙ্গবন্ধুকে নিচে নিয়ে আসার সময় নূর কিছু একটা বললে মহিউদ্দিন সরে দাঁড়ায়। সঙ্গে সঙ্গে বজলুল হুদা ও নূর তাদের স্টেনগান দিয়ে বঙ্গবন্ধুকে গুলি করে। বঙ্গবন্ধুর বুকে ও পেটে ১৮টি গুলি লাগে। নিথর দেহ সিঁড়ির মধ্যে পড়ে থাকে। সারা সিঁড়ি ভেসে যায় রক্তে।

বঙ্গবন্ধুর পেছন পেছন রমাও যাচ্ছিল। কিন্তু, ঘাতকরা তাকে ঘরের মধ্যে যেতে বলে। এর মধ্যে দোতলায় শেখ রেহানার ঘরে থাকা তার চাচা শেখ নাসের ওই কক্ষে যায়। তার হাতে গুলি লাগার ক্ষত ছিলো। রমাই প্রথম বেগম মুজিবকে জানায়, বঙ্গবন্ধুকে গুলি করা হয়েছে। এ সময় ওই ঘরের বাথরুমে আশ্রয় নেন বেগম মুজিব, শেখ জামাল, শেখ রাসেল, সুলতানা কামাল, রোজী জামাল, শেখ নাসের ও রমা। ঘাতকরা বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করে নিচে নেমে এসে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়।

এরপর পরই মেজর আজিজ পাশা ও রিসালদার মোসলেউদ্দিন তাদের সৈন্যসহ বঙ্গবন্ধুর বাড়িতে আসে। আজিজ পাশা তার সৈন্যদের নিয়ে দোতলায় যায়। তারা বঙ্গবন্ধুর ঘরের দরজায় ধাক্কা দিতে থাকে। এক পর্যায়ে তারা দরজায় গুলি করে। তখন বেগম মুজিব দরজা খুলে দেন, এবং ঘরের মধ্যে যারা আছে তাদের না মারার জন্য অনুরোধ করেন। ঘাতকরা বেগম মুজিব, শেখ রাসেল, শেখ নাসের ও রমাকে নিচে নিয়ে আসতে থাকে।

সিঁড়িতে বঙ্গবন্ধুর লাশ দেখেই বেগম মুজিব কান্নায় ভেঙে পড়েন এবং চীৎকার দিয়ে বলেন, 'আমি যাবো না, আমাকে এখানেই মেরে ফেলো।'

বেগম মুজিব নিচে নামতে অস্বীকৃতি জানান। ঘাতকরা শেখ রাসেল, শেখ নাসের ও রমাকে নিচে নিয়ে যায়। আর, বেগম মুজিবকে তার ঘরে নিয়ে আসে। বেগম মুজিবসহ বঙ্গবন্ধুর ঘরে আগে থেকেই অবস্থান নেওয়া শেখ জামাল, সুলতানা কামাল ও রোজী জামালকে নির্বিচারে গুলি করে হত্যা করে আজিজ পাশা ও রিসালদার মোসলেউদ্দিন। বেগম মুজিবের নিথর দেহ ঘরের দরজায় পড়ে থাকে। বাম দিকে পড়ে থাকে শেখ জামালের মৃতদেহ। রোজী জামালের মুখে গুলি লাগে। রক্তক্ষরণে বিবর্ণ হয়ে যায় সুলতানা কামালের মুখ।

শেখ নাসের, শেখ রাসেল আর রমাকে নিচে নিয়ে যাওয়া হয়। তাদের সবাইকে একসঙ্গে লাইনে দাঁড় করায়। এ সময় শেখ নাসের ঘাতকদের উদ্দেশ্যে বলেন, 'আমি তো রাজনীতি করি না। কোনো রকম ব্যবসা-বাণিজ্য করে খাই।' ঘাতকরা একে অপরকে বলে, 'শেখ মুজিব বেটার দ্যান শেখ নাসের।'

এরপর শেখ নাসেরকে বলে, 'ঠিক আছে। আপনাকে কিছু বলবো না। আপনি ওই ঘরে গিয়ে বসেন।' এই বলে তাকে অফিসের সঙ্গে লাগোয়া বাথরুমে

নিয়ে গুলি করে। এরপর শেখ নাসের 'পানি পানি' বলে গোঙাতে থাকেন। তখন শেখ নাসেরের ওপর আরেকবার গুলিবর্ষণ করা হয়। লাইনে দাঁড়িয়ে শেখ রাসেল প্রথমে রমাকে ও পরে মহিতুল ইসলামকে জড়িয়ে ধরে বলে, 'ভাইয়া, আমাকে মারবে না তো?'

মহিতুল জবাব দেয়, 'না ভাইয়া, তোমাকে মারবে না।' এ সময় শেখ রাসেল তার মায়ের কাছে যেতে চাইলে আজিজ পাশা মহিতুলের কাছ থেকে জোর করে তাকে দোতলায় নিয়ে যেতে বলে। আজিজ পাশার কথা মতো এক হাবিলদার শেখ রাসেলকে দোতলায় নিয়ে গিয়ে গুলি করে হত্যা করে। রাসেলের চোখ বেরিয়ে যায়। মাথার পেছনের অংশ থেতলে যায়। রাসেলের দেহটি পড়ে থাকে সুলতানা কামালের পাশে।

পুরো ঘরের মেঝেতে মোটা রক্তের আস্তর পড়ে গেল। এর মাঝেই ঘাতকের দল লুটপাট চালায়। বঙ্গবন্ধুর বাড়িতে সেদিন তার দু'মেয়ে ছিলেন না। বড়ো মেয়ে শেখ হাসিনা, ছোট মেয়ে শেখ রেহানা ও শেখ হাসিনার স্বামী ড. ওয়াজেদ মিয়া তখন জার্মানে ছিলেন, সেখানেই বোনের কাছে গিয়েছিলেন রেহানা।

এরপর খুনি ফারুক রশিদদের ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তে বঙ্গবন্ধু নিহত হলে এ বাড়িটি আবার চলে যায় জিয়া সরকারের নিয়ন্ত্রণে। ১৯৮১ সালে শেখ হাসিনা আওয়ামীলীগের সভানেত্রী নির্বাচিত হয়ে নির্বাসন থেকে ফিরে এলে এই বাড়িটি তিনি ফিরে পান। কিন্তু বছর খানেকের মধ্যে শেখ হাসিনা সংবাদপত্রে একটি নিলাম বিজ্ঞপ্তি দেখতে পান। হাউস বিল্ডিং ফাইনান্স কর্পোরেশনের সে নিলাম বিজ্ঞপ্তির তালিকায় বঙ্গবন্ধুর ৩২ নম্বরের বাড়িটিও ছিল। শেখ হাসিনা কাল বিলম্ব না করে ছুটে যান হাউস বিল্ডিং ফাইনান্স কর্পোরেশনের অফিসে। ১২ হাজার টাকা বকেয়া পরিশোধের পর বাড়িটির দখল তাঁকে বুঝিয়ে দেয়া হয়।

এ বাড়িটি ছিল বাঙালি জাতির পিতার। তাই শেখ হাসিনা পৈতৃক এ বাড়িটিকে নিজে বা তাঁর পরিবারের অন্য কেউ ভোগ দখল না করে বাড়িটিকে বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘর নির্মাণের জন্য দেন। যাতে সব বাঙালি এ বাড়িটিকে নিজেদের বলে দাবি করতে পারে। ১৯৯৪ সালের ১৪ আগস্ট। এ বাড়িটির মধ্যেই বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘরের উদ্বোধন করা হয়।

এই হলো বঙ্গবন্ধুর ৩২ নম্বরের বাড়ির ইতিহাস। এটা এখন আর কোনো সাধারণ বাড়ি নয়, এটি এখন ইতিহাসের বাড়ি। বাঙালির শৌর্য-বীর্যের বাড়ি।◆

শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবসের প্রেক্ষাপট এবং আমাদের কর্তব্য

মাহবুব রেজা

১

মুক্তিযুদ্ধে বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ডের প্রকৃত রহস্য খুঁজতে গেলে মোটা দাগে যে বিষয়টি চিহ্নিত করতে হয় তাহল বাংলাদেশের ধারাবাহিক আন্দোলন-সংগ্রামে বুদ্ধিজীবীদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। ইতিহাস বিশ্লেষকরা শত বছরের পরম্পরার ইতিবৃত্ত তুলে ধরে বলছেন, পাকিস্তানী শাসকেরা ভাল করে বুঝতে পেরেছিলেন এদেশের রাজনৈতিক নেতাদের নেপথ্য শক্তির আঁধার হিসেবে কাজ করেছে বুদ্ধিজীবীদের সুদূরপ্রসারী চিন্তাভাবনা। দেশভাগেরও বহু বছর আগে থেকে তারা রাজনৈতিক নেতাদের বুদ্ধিবৃত্তিক প্রজ্ঞাকে শাণিত করতে সহায়ক ভূমিকা রেখেছেন। দেশভাগের পর থেকে রাজনৈতিক সংকট আর নানা চড়াই-উৎরাই অতিক্রম করতে নেতাদের নেপথ্য শক্তি হিসেবে কাজ করেছে। মুক্তিযুদ্ধের শুরু থেকে শেষ দিন পর্যন্ত বুদ্ধিজীবীরা নানাভাবে তাদেরকে উজ্জীবিত করেছেন দেশে- বিদেশে। এছাড়া পূর্ব বাংলা বা পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক, সামজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনসহ জমিদারি প্রথা, সামন্ততান্ত্রিক সমাজ

ব্যবস্থার বিলুপ্তি ও তৎকালীন নব্য মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব, পুনর্বিন্যাসে বুদ্ধিজীবীদের ছিল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। দেশভাগের পর থেকে পাকিস্তানী শাসকদের চক্ষুশূলে পরিণত হয় দেশের প্রগতিশীল এই অংশটি। রাজনৈতিক নেতাদের দমন পীড়নের মধ্যেও বুদ্ধিজীবীরা তাদের ভূমিকা রেখেছে নানা ভাবে। জেনারেল আইয়ুব খানের সামরিক শাসনের সময়ও সে সময়ের সরকারকে রাজনৈতিক দলগুলোর পাশাপাশি বিভিন্ন প্রগতিশীল সংগঠনের ব্যানারে সমাজের প্রাগ্রসর মননশীল মানুষেরা সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করার কাজটি করে যেতে থাকে যা একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত প্রবহমান ছিল। ফলে সামরিক জান্তা রাজনৈতিক দলগুলোর বাইরে প্রগতিশীল অংশটিকেও নিজেদের প্রতিপক্ষ মনে করতে থাকে। ১৯৬১ সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম শতবার্ষিকীর আয়োজনকে কেন্দ্র করে সামরিক জান্তা যে নগ্নরূপে আবির্ভূত হয়েছিল তার বিরুদ্ধে এককভাবে লড়েছিল বুদ্ধিজীবীদের অংশটি। বিভিন্ন সময় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নিয়েছে তারা। এরপর বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের সব রকম লড়াই-সংগ্রামে এই অংশটি সক্রিয় ভূমিকা রেখেছে যা পাকিস্তানি শাসকদের খেপিয়ে তুলেছিল। ফলে তারা সুযোগে ছিল কখন দেশের এই শুভ বুদ্ধিসম্পন্ন অংশটিকে শেষ করা যায়। মুক্তিযুদ্ধে যখন নিজেদের পরাজয় নিশ্চিত তখন পাকিস্তানি শাসকরা ঠাণ্ডা মাথায় এদেশীয় রাজাকার-আলবদর আল-শামসের সহায়তায় বুদ্ধিজীবী নিধনের নামে মেতে ওঠে এক পৈশাচিক হত্যাকাণ্ডে। প্রখ্যাত সাংবাদিক এন্থনি মাসকারেনহাসের 'রেইপ অব বাংলাদেশ' গ্রন্থে মুক্তিযুদ্ধে বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ডকে একটি সুদূরপ্রসারী, পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

২

১৯৭২ সালের ২রা জানুয়ারি দৈনিক আজাদ পত্রিকায় 'কাঁটাসুরের বধ্যভূমি' শীর্ষক এক মর্মস্পর্শী প্রতিবেদনে অধ্যাপিকা হামিদা রহমান বুদ্ধিজীবীদের নির্মম হত্যাকাণ্ডের বিবরণ লিপিবদ্ধ করতে গিয়ে যে বিবরণ তিনি উল্লেখ করেছেন তা সত্যি সত্যি আমাদের হৃদয়কে বেদনাহত করে। আমাদের অস্তিত্বকে নাড়া দেয়। কাঁটাসুরের বধ্যভূমি প্রতিবেদনে অধ্যাপিকা হামিদুর রহমান লিখছেন, 'আর একটু দূরে যেতেই দেখতে পেলাম, একটি কঙ্কাল। শুধু পা দুটো আর বুকের পাঁজরটিতে তখনও অল্প মাংস আছে। বোধহয় চিল-শকুন খেয়ে গেছে। কিন্তু মাথায় খুলিটিতে লম্বা লম্বা চুল। চুলগুলো ধুলো-কাদায় মিলে গিয়ে নারীদেহের সাক্ষ্য বহন করছে। আর একটু এগিয়ে যেতেই একটা উঁচু স্থানে বেশ কয়েকজন লোক দাঁড়িয়ে ঝুঁকে পড়ে কী যেন দেখছে। আমি উপরে উঠতে একজন ভদ্রলোক হাত বাড়িয়ে আমাকে উপরে উঠিয়ে নিলেন। সামনে দেখি নিচু জলাভূমির ভেতর

এক ভয়াবহ বীভৎস দৃশ্য। সেখানে এক নয়, দুই নয় একেবারে বারো-তেরোজন সুস্থ- সবল মানুষ। একের পর এক শুয়ে আছে। পাশে দুটো লাশ, তার একটির হৃৎপিণ্ড যেন কেউ ছিঁড়ে নিয়েছে। সেই হৃৎপিণ্ড ছেঁড়া মানুষটি হলো ডাক্তার রাব্বী।...মাঠের পর মাঠ চলে গিয়েছে। প্রতিটি জলার পাশে হাজার হাজার মাটির ঢিবির মধ্যে কঙ্কাল সাক্ষ্য দিচ্ছে কত লোককে যে মাঠে হত্যা করা হয়েছে।'

৩

আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধে দেশের মানুষ অকাতরে নিজের বুকের রক্ত দিয়ে, জীবন দিয়ে এদেশের সম্মানকে সমুন্নত রেখেছে। বাংলার মা-ভাই-বোন-কৃষক-শ্রমিক- ছাত্র-জনতা সবাই এক কাতারে নেমে এসে দেশের জন্য যুদ্ধ করে প্রমাণ করেছে বাংলার মাটি দুর্জয় ঘাঁটি। যুদ্ধে যখন বাঙালি বিজয়ের দ্বারপ্রান্তে এসে উপস্থিত তখন পাকিস্তানের গভর্নরের সামরিক উপদেষ্টা মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলী এক সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। তিনি এদেশের শ্রেষ্ঠ মানুষদের নিঃশেষ করে বাঙালি জাতিকে মেধাশূন্য করার ষড়যন্ত্রে মেতে ওঠেন। তারই পরিকল্পনা মাফিক পাকিস্তানি বাহিনীর সহযোগিতায় রাজাকার, আলবদর, আলশামস বাহিনী দেশের শ্রেষ্ঠ সন্তানদের ধরে ধরে নির্মমভাবে হত্যা করে। ইতিহাসের জঘন্যতম হত্যাকাণ্ড চালায় পাকিস্তানি হানাদারবাহিনী। বাঙালি শিক্ষাবিদ, সাংবাদিক, সাহিত্যিক, চিকিৎসক, বিজ্ঞানী, আইনজীবী, শিল্পী, দার্শনিক ও রাজনৈতিক চিন্তাবিদগণ এই সুপরিকল্পিত হত্যাযজ্ঞের শিকার হন। বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের নিশ্চিহ্ন করার এই নীলনকশা প্রণয়ন করে ১২ ডিসেম্বর পূর্ব পাকিস্তানের সেনা সদর দফতরে আলবদর ও আলশামস বাহিনীর হাতে বুদ্ধিজীবীদের তালিকা তুলে দেন তিনি। পাকিস্তানি বাহিনীর অস্ত্র সহায়তা নিয়ে

তাদেরই ছত্রছায়ায় আধাসামরিক বাহিনী আলবদরের ক্যাডাররা এই বর্বরোচিত হত্যাযজ্ঞ সংঘটিত করে। যদিও এর আগেই সারাদেশেই শুরু হয়ে গিয়েছিল বুদ্ধিজীবী নিধনযজ্ঞ।

ইতিহাসবিদরা এই দিনটিকে পৃথিবীর ইতিহাসের একটি কালো অধ্যায় হিসেবে উল্লেখ করেন। তারা বলছে, যুদ্ধের শেষের দিকে এসে পাকিস্তানি বাহিনী তাদের নিশ্চিত পরাজয়ের আগাম টের পেয়ে যায়। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে বাঙালি বুদ্ধিজীবী নিধনের বিষয়টিকে বিশেষভাবে প্রাধান্য দিতে শুরু করেন পাকিস্তানিরা। একাত্তরের ১০ ডিসেম্বর পাকিস্তানি বাহিনীর এদেশীয় দোসর রাজাকার, আল শামস, আলবদর বাহিনীর সদস্যরা তুলে নিয়ে যায় দৈনিক ইত্তেফাকের কার্যনির্বাহী সম্পাদক সিরাজুদ্দীন হোসেন ও পিপিআই-এর চিফ রিপোর্টার সৈয়দ নাজমুল হককে। গবেষকরা অবশ্য তাদের গবেষণায় বলছেন, ২৫ মার্চের কালো রাতেই পাকিস্তানিরা অনানুষ্ঠানিকভাবে শুরু করে বুদ্ধিজীবীদের নিধন এবং তা' চলে যুদ্ধের পুরো নয় মাস জুড়ে। এমনকি ৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বরে বিজয় লাভের পরেও বুদ্ধিজীবীদের নিধন অব্যাহত থাকে। যেমন ড. মনসুর আলীকে হত্যা করা হয় ২১ ডিসেম্বর আর চলচ্চিত্রকার, গল্পকার জহির রায়হান নিখোঁজ হন বাহাত্তরের ৩০ জানুয়ারি মিরপুরে। বুদ্বিজীবীদের এই হত্যাযজ্ঞ শুরু হয় এবং ক্রমে তা সমগ্র দেশে বিশেষত জেলা ও মহকুমা শহরে সম্প্রসারিত হয়। হত্যাকারীরা বুদ্ধিজীবীদের গেস্টাপো কায়দায় ধরে নিয়ে কালো কাপড় দিয়ে চোখ বেঁধে কোন বিশেষ ক্যাম্পে বা বধ্যভূমিতে নিয়ে গিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করেছে। প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায়, শহরে জারিকৃত কারফিউয়ের সুযোগে বুদ্ধিজীবীদের বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে তাদের ওপর চালানো হয়েছিল নির্মম নির্যাতন। যে নির্যাতনকে হার মানায় মধ্যযুগীয় বর্বরতা। বেয়নেটের আঘাতে ক্ষতবিক্ষত করে হত্যা করা হয়েছিল দেশের শ্রেষ্ঠ সন্তানদের।

জানা যায়, ঢাকা শহরের দু'টি বধ্যভূমির মধ্যে একটি ছিল মোহাম্মদপুরের কাছে রায়ের বাজারের জলাভূমি, অপরটি ছিল মিরপুরে। যুদ্ধের পরে এ দুটি বধ্যভূমির ডোবা, নালা, ইটের পাঁজার মধ্যে অসংখ্য মৃতদেহ বিক্ষিপ্ত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখা গেছে। এসব মৃতদেহের অধিকাংশের চোখ কালো কাপড়ে বাঁধা ছিল, হাত পেছন দিক থেকে বাঁধা। এসব মৃতদেহের মাথায় ও পিঠে বুলেটের চিহ্ন ছিল। আর সারা দেহে ছিল বেয়নেটের ক্ষতচিহ্ন।

৪

বাহাত্তরের ৮ই জানুয়ারি দৈনিক পূর্বদেশ পত্রিকায় মিরপুরের শিয়ালবাড়ী বধ্যভূমি নিয়ে আনিসুর রহমানের একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। প্রতিবেদনে

কুটি কুটি করে কাঁটা বুদ্ধিজীবীদের হাড়ের ছবিও ছাপা হয়। বধ্যভূমির সেই প্রতিবেদন তিনি উল্লেখ করেছেন, ' ...অথবা যদি না যেতাম সেই শিয়ালবাড়ীতে তাহলে দেখতে হতো না ইতিহাসের বর্বরতম অধ্যায়কে। অনুসন্ধিৎসু হিসেবে যা দেখাও কোনো মানুষের উচিত নয়। ওখানে না গেলে গায়ে ধরত না এমন দহনজ্বালা। সহ্য করতে হতো না ভয়-ক্রোধ, ঘৃণা মিশ্রিত এমন তীব্র অনুভূতি– যে অনুভূতি বলে বুঝাবার নয়।'

মুক্তিযুদ্ধের একেবারে শেষের দিকে পাকিস্তানীরা যখন নিজেদের করুণ পরাজয়ের ইঙ্গিত পেল তখন তারা জানোয়ারের রূপ ধারণ করল। শুরু হল ইতিহাসের বুকে এক জঘন্য হত্যাকাণ্ড যা বর্ণনা করাও দুঃসাধ্য। জানোয়ারদের এই হত্যাকাণ্ড থেকে বুদ্ধিজীবী, উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ কেউ-ই রেহাই পায়নি। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ঢাকাসহ সারাদেশে বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ডের স্থান আবিষ্কৃত হতে থাকে। উদ্ধার করা হয় কঙ্কাল। হাড়গোড়।

১৯৭১ সালের ১৯ শে ডিসেম্বর দৈনিক বাংলা পৃথিবীর নিষ্ঠুরতম বধ্যভূমি আবিষ্কৃত হওয়ার ঘটনা নিয়ে 'শতাব্দীর জঘন্যতম হত্যাকাণ্ড সংঘটন করেছে আলবদর বর্বর বাহিনী' শিরোনামের প্রতিবেদনে বলা হয়, 'স্বাধীনতার আনন্দ, উচ্ছাসের মাঝে গতকাল শনিবার বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা নগরীতে করুণ ছায়া নেমে আসে। মুক্তির আনন্দকে ছাপিয়ে ওঠে কান্নার রোল। শতাব্দীর জঘন্যতম হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে ঢাকা নগরী ও বাংলাদেশে গত ফেব্রুয়ারি থেকে। তা আরো চরম হয়ে উঠেছিল মুক্তির পূর্বক্ষণে।... গতকাল রায়েরবাজার ও ধানমন্ডি এলাকায় বিভিন্ন গর্ত থেকে প্রচুর সংখ্যক লাশ উদ্ধার করা হয়। এদের

মধ্যে অধ্যাপক, ডাক্তার, সাংবাদিক ও সাহিত্যিকদের লাশও রয়েছে। এ পর্যন্ত কতিপয় লাশ চেনারও উপায় নেই।'

বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ড নিয়ে যারা দীর্ঘদিন ধরে গবেষণা করছেন তারা বলছেন, বাঙালির চিন্তার জগতকে নিশ্চিহ্ন করতেই বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ডের এই নীলনকশা প্রণয়ন করে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নরের সামরিক উপদেষ্টা মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলী। ১২ ডিসেম্বর সেনা সদর দফতরে আলবদর ও আলশামস বাহিনীর হাতে বুদ্ধিজীবীদের তালিকা তুলে দেন তিনি। পাকিস্তানি বাহিনীর অস্ত্র সহায়তা নিয়ে তাদেরই ছত্রছায়ায় আধাসামরিক বাহিনী আলবদরের ক্যাডাররা এই বর্বরোচিত হত্যাযজ্ঞ সংঘটিত করে। যদিও এর আগেই সারাদেশেই শুরু হয়ে গিয়েছিল বুদ্ধিজীবী নিধনযজ্ঞ। ১০ ডিসেম্বর এই আলবদর বাহিনীর সদস্যরা তুলে নিয়ে যায় দৈনিক ইত্তেফাকের কার্যনির্বাহী সম্পাদক সিরাজুদ্দীন হোসেন ও পিপিআই-এর চিফ রিপোর্টার সৈয়দ নাজমুল হককে। এরই ধারাবাহিকতায় দেশ জুড়ে চলতে থাকে এই জঘন্য অপকর্ম।

ঘাতকরা বেছে বেছে দেশের সূর্য সন্তানদের হত্যা করেছিল। নয় মাসের মুক্তিযুদ্ধের শহিদ বুদ্ধিজীবীদের সংখ্যা এখনো সঠিক পূর্ণাঙ্গভাবে নির্ণয় করা যায়নি। তবে বাংলাপিডিয়ার তথ্যমতে, শহিদ হওয়া বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে রয়েছে শিক্ষাবিদ ৯৯১ জন, চিকিৎসক ৪৯ জন, আইনজীবী ৪২ জন, সাংবাদিক ১৩ জন, সাহিত্যিক ৯ জন এবং প্রকৌশলী ৫ জন।

স্বাধীনতার প্রায় ৫০ বছর পরে সরকার শহীদ বুদ্ধিজীবীর একটি পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রণয়নের কাজ শুরু করেছে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় ১৩ই ডিসেম্বর শহীদ বুদ্ধিজীবীদের একটি প্রাথমিক তালিকা চূড়ান্ত করেছে। এতে ১২২২ জন শহীদ বুদ্ধিজীবীর নাম অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। শহীদ বুদ্ধিজীবীদের তালিকা তৈরির কাজ প্রথমে ১৯৭২ সালে শুরু হলেও সে তালিকা কখনো সরকারি নথি বা গেজেটভুক্ত হয়নি। এখন যে ১২২২ জনের প্রাথমিক তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে তা গেজেটভুক্ত করা হবে।

শিক্ষকদের যাদের হত্যা করেছিল তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মধ্যে ছিলেন এ এন এম মুনীর চৌধুরী, ড. জিসি দেব, মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী, আনোয়ার পাশা, ড. জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা, আবদুল মুকতাদির, এস এম রাশীদুল হাসান, ড. এন এম ফয়জুল মাহী, ফজলুর রহমান খান, এ এন এম মুনীরুজ্জামান, ড. সিরাজুল হক খান, ড. শাহাদাত আলী, ড. এম এ খায়ের, এ আর খান খাদিম, মো. সাদেক, শরাফত আলী, গিয়াসউদ্দিন আহমেদ, অনুদ্বৈপায়ন ভট্টাচার্য। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ছিলেন অধ্যাপক মীর আবদুল কাইয়ুম, হবিবর রহমান, সুখরঞ্জন সমাদ্দার, ড. আবুল

কালাম আজাদ। সাংবাদিক হিসেবে ছিলেন সিরাজুদ্দীন হোসেন, শহীদুল্লা কায়সার, খোন্দকার আবু তালেব, নিজামুদ্দীন আহমদ, আ ন ম গোলাম মোস্তফা, শহীদ সাবের, শেখ আবদুল মান্নান (লাডু), সৈয়দ নজমুল হক, এম আখতার, আবুল বাসার, চিশতী হেলালুর রহমান, শিবসদন চক্রবর্তী, সেলিনা পারভীন। এছাড়া শিল্পী আলতাফ মাহমুদ, মেহেরুন্নেসা, দানবীর রণদাপ্রসাদ সাহাসহ আরো অনেক নাম রয়েছে।

৬

পাক-বাহিনী এবং তাদের দোসর রাজাকার, আল-বদর, আল-শামস কর্তৃক বুদ্ধিজীবীদের হত্যাযজ্ঞের স্মরণে বাঙালি জাতি সশ্রদ্ধ চিত্তে ১৯৭২ সাল থেকে ১৪ই দিসেম্বরকে শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস পালন করে আসছে। বাংলাদেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমেদ ১৪ ডিসেম্বরকে শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস ঘোষণা করেছিলেন কারণ, অপহরণ ও পরে নির্বিচারে হত্যা এই ১৪ই ডিসেম্বরেই অর্থাৎ পাক-বাহিনীর আত্মসমর্পণ এবং বাঙালির বিজয় অর্জন তথা বিজয় দিবসের ঠিক দু'দিন পূর্বে, সংগঠিত হয়েছিল সবচেয়ে বেশী।

২০ ডিসেম্বর ১৯৭১-এ, মুজিবনগর সরকারের এক মুখপাত্র জানান, ১৬ ডিসেম্বরে আত্মসমর্পণের পূর্বে পাক-বাহিনী এবং তাদের সহযোগীরা মিলে ৩৬০ জন বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করে। ১৯৯৪ সালে পুনঃমুদ্রিত বাংলা একাডেমী কর্তৃক প্রকাশিত শহীদ বুদ্ধিজীবী সম্পর্কিত তথ্যকোষ 'শহীদ বুদ্ধিজীবী কোষগ্রন্থ'-এ শহীদ বুদ্ধিজীবীদের সংখ্যা ২৩২ জন উল্লেখ করা হলেও তা সংশোধনের পর্যায়ে রয়েছে বলে জানা যায়। এই তথ্যকোষে শহীদ আখ্যায়িত হয়েছেন তারা যাদের পাক-বাহিনী এবং দোসরেরা (রাজাকার, আল-বদর, আল-শামস) বিভিন্ন সময় নির্বিচারে হত্যা করেছিল এবং যারা ২৫ মার্চ ১৯৭১ থেকে ৩১ জানুয়ারি ১৯৭২ সময়কাল থেকে নিখোঁজ। লেখক, বিজ্ঞানী, চিত্রশিল্পী, সংগীত শিল্পী, শিক্ষক, গবেষক, সাংবাদিক, উকিল, চিকিৎসক, স্থপতি, ভাস্কর, সরকারি-বেসরকারি কর্মী, নাট্য-কর্মী, জনসেবায় নিয়োজিত কর্মীদের বুদ্ধিজীবী হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। ১৯৭২ সালে সরকার কর্তৃক প্রকাশিত 'বাংলাদেশ' নামক প্রামাণ্য চিত্রে বলা হয়, স্বাধীনতা যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে ৬৩৭ জন প্রাইমারি স্কুল শিক্ষক, ২৭০ জন সেকেন্ডারি স্কুল শিক্ষক এবং ৫৯ জন কলেজ-শিক্ষককে হত্যা করা হয়।

৭

দৈনিক পত্রিকাগুলো নিখোঁজ বুদ্ধিজীবীদের নিয়ে ডিসেম্বরের দ্বিতীয় এবং চতুর্থ সপ্তাহে প্রতিবেদন প্রকাশ করে। গোপন তথ্যসূত্রের ভিত্তিতে, ১৮ই ডিসেম্বরে একদল সাংবাদিক ঢাকার পশ্চিমে, রায়ের বাজার এলাকায় পচনশীল, ক্ষত-বিক্ষত লাশের একটি গণ-কবরের সন্ধান লাভ করে। জাতির মেধাবী

ব্যক্তিবর্গের দেহগুলো অত্যাচারের সুস্পষ্ট চিহ্ন নিয়ে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে, একে-অন্যের নীচে চাপা পড়ে ছিল। লালমাটিয়ায় শারীরিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে সাংবাদিকরা একটি বন্দীশালা আবিষ্কার করে, যা ছিল রাজাকার, আল-বদর, আল-শামসদের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র।

ঢাকা ইউনিভার্সিটির শিক্ষক আবুল কালাম আজাদ এবং কামালউদ্দিন, চিকিৎসক ফজলে রাব্বী, আব্দুল আলিম চৌধুরী, আবুল খায়ের এবং সাংবাদিক মুহাম্মদ আখতার– পচনশীল লাশগুলো পরিবার কর্তৃক সনাক্ত করা হয় সেদিনই। সাংবাদিক সেলিনা পারভিন এর লাশ সনাক্ত করা হয় পরের দিন। ঢাকা বিশ্ব বিদ্যালয়ের শিক্ষক সন্তোষ চন্দ্র ভট্টাচার্য, সিরাজুল হক, ফাইজুল মহি এবং চিকিৎসক গোলাম মুর্তোজা, আজহারুল হক, হুমায়ুন কবীর ও মনসুর আলী'র লাশ পরবর্তীতে চিহ্নিত করা হয়। লাশ সনাক্তকরণের সময় শহীদ বুদ্ধিজীবীদের পরিবারের সদস্যদের অনেকেই সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়েছিলেন।

এরকম আরো বধ্যভূমি ছিল মিরপুর এবং রায়ের বাজার এলাকায়, তেজগাঁও এর কৃষি বর্ধিতকরণ বিভাগের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, মহাখালীর টি.বি. হাসপাতাল সহ সারাদেশের বিভিন্ন জায়গায়। অনেক লাশই পরবর্তীতে সনাক্তকরণের পর্যায়ে ছিল না। এসময় সংবাদপত্রগুলো নিখোঁজ বুদ্ধিজীবীদের (নভেম্বরের শেষের দিকে এবং ডিসেম্বরের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত অপহরণ অথবা গ্রেফতারকৃত) নিয়ে নিয়মিত প্রতিবেদন প্রকাশ করছিল।

বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ডটি যে একটি সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা সেটা ধিরে ধিরে পরিষ্কার হয়ে ওঠে মানুষের কাছে। বুদ্ধিজীবী মফিজউদ্দিনের (লাশ বহনকারী বাহনের চালক) স্বীকারোক্তি অনুযায়ী আশরাফুজ্জামান খান, ইসলামি ছাত্র সংস্থার কেন্দ্রীয় কমিটির সাবেক সদস্য এবং পাকিস্তান রেডিও'র সাবেক কর্মী, নিজ হাতে

সাত জন শিক্ষককে গুলি করেন। মফিজউদ্দনের স্বীকারোক্তি অনুযায়ী এমন দুর্ভাগ্যজনকভাবে মৃত্যুবরণকারী শিক্ষকদের লাশ উদ্ধার করা হয় রায়ের বাজার বধ্যভূমি এবং মিরপুরের শিয়াল বাড়ির গণ কবর থেকে। তার ডায়েরিতে ২০ জন শিক্ষক সহ আরো অনেক বাঙালির তালিকা ছিল। তার ডায়েরিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৬ জন শিক্ষকের নাম ছিল যারা পাক-বাহিনীকে সহযোগিতা করেছিল।

বুদ্ধিজীবী হত্যা পরিকল্পনায় পাক-বাহিনীর ব্রিগেডিয়ার কাসেম এবং ক্যাপ্টেন কাইয়ুম ছিল মূল হোতা। নভেম্বর মাসের কোন এক সময় তারা মওলানা আব্দুল মান্নানের বাসগৃহে মাদ্রাসা শিক্ষক সংঘের প্রেসিডেন্ট সহকারে বৈঠক করে। গবেষকরা বলছেন, মওলানা আব্দুল মান্নানের বাসগৃহে অনুষ্ঠিত আলোচনাতেই বুদ্ধিজীবীদের হত্যার মূল পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়।

৮

না, আমি আসিনি
ওল্ড টেস্টামেন্টের প্রাচীন পাতা ফুঁড়ে,
দুর্বাঘাসও নই,
তবু আজ এখানে দাঁড়িয়ে এই রক্ত গোধুলিতে
অভিশাপ দিচ্ছি
আমাদের বুকের ভেতর যারা ভয়ানক কৃষ্ণপক্ষ দিয়েছিল সেঁটে,
মগজের কোষে কোষে যারা
পুঁতেছিল আমাদেরই আপনজনের লাশ
দগ্ধ রক্তাপ্লুত,
যারা গণহত্যা
করেছে শহরে গ্রামে টিলায় নদীতে ক্ষেত ও খামারে,
আমি অভিশাপ দিচ্ছি নেকড়ের চেয়ে অধিক
পশু সেই সব পশুদের।
(অভিশাপ দিচ্ছি/ শামসুর রাহমান)

১৪ ডিসেম্বর পৃথিবীর বাংলা ভাষাভাষী সকল বাঙালির স্মরণের দিন। বেদনার দিন। স্বজন হারানর দিন। বাঙালি প্রতি বছর বুদ্ধিজীবী দিবস পালনের মধ্য দিয়ে তাদের ঋণ শোধ করে। এদেশের পলিমাটি, সবুজ বনবনানি, পাখপাখালি, নদ নদী আর উদার আকাশ উন্মুখ হয়ে একাত্তরে শহীদ হওয়া সূর্য সন্তানদের স্মরণ করে।

বুদ্ধিজীবী দিবস আমাদেরকে নতুন স্বপ্নে বেঁচে থাকার প্রেরণা যোগায়। বুদ্ধিজীবীদের অপূর্ণ স্বপ্ন নতুন প্রজন্ম সার্থক করে তুলবে– এমন প্রত্যাশা সব বাঙালির।♦

সুন্দরবনের গোপন ঘাঁটিতে নৌ-কমান্ডোদের একটি দল– মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর

একাত্তরে বাঘের মতো গর্জে ওঠেছিল

সুন্দরবনের নদী

ফয়সাল আহমেদ

১৯৭১ সালে মুক্তিযোদ্ধারা সাধ্যের সর্বোচ্চ ঢেলে দিয়ে জল, স্থল আর আকাশপথে লড়াই করে। নয় মাসের এই যুদ্ধে অন্য অনেককিছুর মতো বাংলার প্রাণ-প্রকৃতি, বিশেষত নদ-নদীগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে বঙ্গোপসাগরের তীর ঘেঁষে গড়ে উঠা পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট সুন্দরবন ও তার নদীগুলো। বাংলাদেশের তিন জেলা খুলনা, সাতক্ষীরা ও বাগেরহাট জুড়ে এর অবস্থান। বাকি অংশ পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের দুই জেলা উত্তর চব্বিশ পরগনা ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জুড়ে এর বিস্তৃতি। মোট বনের শতকরা

৬২ ভাগ বনাঞ্চল বাংলাদেশের আর ৩৮ ভাগ ভারতের। আয়তনের দিক থেকে বাংলাদেশ অংশের পরিমাণ প্রায় ৬০১৭ বর্গকিলোমিটার। সুন্দরবনের নদীগুলো নোনা পানি ও মিঠা পানির মিলন স্থান। গঙ্গা থেকে আসা নদীর মিঠা পানি, বঙ্গোপসাগরের নোনা পানি হয়ে ওঠার মধ্যবর্তী স্থান হলো এ এলাকাটি। ছোট-বড় বেশকিছু নদী বহমান এই সুন্দরবনকে ঘিরে। এর প্রায় ২০ ভাগই নদী-নালায় বেষ্টিত। বলেশ্বর, ভোলা, নীলকমল, পশুড়, পাথুরিয়া, বাংরা, রায়মঙ্গল, মালঞ্চ, শিবশা, শেলা, হরিণঘাটা নদী এরমধ্যে উল্লেখযোগ্য। কয়েক হাজার বছরের পুরনো এই প্রাকৃতিক বনাঞ্চল মুক্তিযুদ্ধের পরও আম্ফান, সিডর, আইলা, গোর্কির মতো ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগের ছোবল সয়ে নিজে বিবর্ণ হয়েছে, ক্ষতবিক্ষত হয়েছে তবু সুরক্ষা দিয়েছে দেশের মানুষকে। এরমধ্য দিয়ে সুন্দরবনের অকৃত্তিম উদারতার প্রমাণ পাওয়া যায়। রহস্যে ঘেরা, গভীর অরণ্যের এই বনাঞ্চল বৃটিশবিরোধী আন্দোলনের সময়ও বিপ্লবীদের আশ্রয়স্থল হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।

সুন্দরবন ক্যাম্প

প্রাকৃতিকভাবেই লড়াকু এই বন ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় মুক্তিবাহিনীর গুরুপূর্ণ ঘাঁটি হয়ে ওঠে। যা সুন্দরবন সাবসেক্টর হিসেবে পরিচিত। বাগেরহাট জেলার শরণখোলা রেঞ্জের মধ্যে ছিল সাবসেক্টরের হেডকোয়ার্টার। ৯ নম্বর সেক্টরের সুন্দরবন অঞ্চলটি ছিল নদীবহুল। এই এলাকায় নদ-নদী, খাল-বিল মাকড়সার জালের মতো বিস্তৃত। ১৯৭১ সালের জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে মেজর জিয়াউদ্দিনের নেতৃত্বে সুন্দরবনের ভিতরে আড়াইবাঁকী, মাইঠার ও মূর্তির খালের সংযোগস্থলে একটি ক্যাম্প স্থাপন করা হয়। জায়গাটি বেশ খানিকটা উঁচু হওয়ায় বসবাসের জন্য নিরাপদ মনে করা হয়। জিয়াউদ্দিনের নেতৃত্বে তিনিসহ মোট ১৪জন মুক্তিযোদ্ধা বড় একটি জেলে নৌকা নিয়ে সেদিন ধানসাগর খালের মধ্য দিয়ে ভোলা নদী পার হয়ে সুন্দরবনে প্রবেশ করেন। তাঁদের সাথে থাকা নৌকার দুই মাঝিও সেদিন দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করেছিল। স্থানটি মেজর জিয়াউদ্দিনের পছন্দ হওয়ায় এখানেই ক্যাম্প স্থাপনের সিদ্ধান্ত হয়। মুক্তিযুদ্ধে অসামান্য অবদান রাখা এই ক্যাম্পটি মেজর জিয়াউদ্দিনের বিশেষ আগ্রহেই প্রতিষ্ঠিত হয়। মেজর জিয়াউদ্দিন তাঁর 'মুক্তিযুদ্ধে সুন্দরবন' বইতে লিখেছেন– 'সত্যি বলতে কি সুন্দরবনে কিভাবে থাকবো সেটা আমি নিজেও জানি না। ষষ্ঠ দিনে আমি খুব দুঃশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়লাম। দুপুরে খেলাম। কিন্তু মনটা খুব ভারাক্রান্ত। মাথায় চিন্তা, মুক্তিযুদ্ধ এগোছে কোথায়? পাঞ্জাবিদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ কোথায়? পাঞ্জাবিদের বিরুদ্ধে আক্রমণ কোথায়? পাঞ্জাবিদের ওপর অ্যাম্বুশ কোথায়? পাকিস্তানিদের ওপর রেইড এবং স্টকিং কোথায়? কিছুইতো

হচ্ছে না। এ সব ভাবনায় মনটা আচ্ছন্ন। দুপুরের পর শুয়ে-শুয়ে ঝিমাচ্ছি আর চিন্তা করছি সুন্দরবনের মধ্যে কিভাবে ঘঁটি করে বাহিনী গড়া যায়। আমরা থাকবো কি করে? ঝিমোতে ঝিমোতে হঠাৎ করে মাথার মধ্যে একটা চিন্তা খেলে গেল। একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললাম মুহূর্তের মধ্যে। আমি শোয়া থেকে উঠে বসে মাঝিকে বললাম, 'আমাদের নৌকাটা পাড়ে ভিড়িয়ে দাও।' মাঝি আদেশমতো কাজ করল। নৌকা পাড়ে ভিড়ানোর পর মাঝিকে বললাম, 'তোমার কাছে কুড়াল-টুড়াল জাতীয় কিছু আছে? থাকলে দাও।' মাঝি বললো, 'হ্যাঁ, কাছে একটা কুড়াল আছে।' মাঝির কাছে থেকে কুড়াল নিয়ে আমি নেমে পড়লাম। রওনা দিলাম বনের দিকে। নৌকাতে যেসব মুক্তিযোদ্ধা ছিল তারা অবাক হয়ে কমান্ডারের কাজকর্ম দেখছে। দু'এক মিনিটের মধ্যে খবরটা সব নৌকায়-নৌকায় ছড়িয়ে পড়লো যে, তাদের কমান্ডার একটা কুড়াল নিয়ে সুন্দরবনে চলে গেছে। অল্পক্ষণের মধ্যেই সামসুল আলম তালুকদার, কবির আহমেদ মধুসহ প্রায় সবাই এসে হাজির। ইতোমধ্যে আমি প্রায় দু'আড়াইশ গজ ভেতরে ঢুকে একটা গাছ কাটতে আরম্ভ করেছি। সিনিয়র কমান্ডাররা এসে দেখল তাদের কমান্ডার নিজে কুড়াল দিয়ে গাছ কাটছে। ওরা বললো, 'কি ব্যাপার, আপনি নিজে গাছ কাটছেন? দেন আমাদের কাছে কুড়াল দেন। আমরা কেটে দিচ্ছি। আপনি গাছ কাটছেন-জ্বালানি কাঠের অভাব হলো নাকি?' ওরা বেশ বিব্রত ভঙ্গিতে কথাগুলো বলল। আমি বললাম, 'যদি আপনাদের কিছু করতে ইচ্ছা করে, তাহলে আপনাদের নৌকাতে যে কুড়ালগুলো আছো সেগুলো নিয়ে আসুন এবং আমি যা করছি তাই করুন।' ওরা কেউ কেউ আমার কথা বুঝল, কেউ হয়তো বুঝল না কেন বলছি। তবে সবাই গিয়ে যার যার নৌকা থেকে কুড়াল নিয়ে এল। প্রায় চল্লিশটার মতো কুড়াল জোগাড় হল। শুরু হলো গাছ কাটা। দু'ঘণ্টার মধ্যে মোটামুটি তিনচার বিঘা জায়গার গাছ কেটে পরিষ্কার করা হল। তারপর আমি ওদের জায়গা নির্দেশ করে দেখালাম, এই পাশে মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য ব্যারাক তৈরি হবে। এই পাশে রান্নাঘর তৈরি হবে। এই পাশে বাংকার তৈরি হবে। এখানে ট্রেনিং গ্রাউন্ড তৈরি হবে। এখানে ক্যাম্প ফায়ারের ব্যবস্থা হবে। এভাবে জায়গা ভাগ করে দিয়ে আমি ওখানেই বসলাম। শুরু হলো কাজ। রাত আটটার মধ্যেই মুক্তিযোদ্ধাদের বাসযোগ্য একটা ব্যারাক তৈরি হয়ে গেল।' [পৃষ্ঠা-১১৮-১৯]

কেন সুন্দরবনের এই অংশকেই ক্যাম্প স্থাপনের জন্য নির্বাচন করা হলো? মেজর জিয়াউদ্দিন বলছেন–'আমাদের মূল ঘাঁটির অবস্থান ছিল তেঁতুলবুনিয়া নামক ছোট্ট একটি নদীর দু'পাশ ঘিরে। এই মূল অবস্থানগুলো আমরা বেশ সুদৃঢ় করেছিলাম। তেঁতুলবুনিয়া আসলে ছিল একটা মরা নদী যার সামনের অংশ মৃত।

এটাকে গেরিলাদের মূল ঘঁটি এলাকা হিসেবে নির্বাচিত করলাম সুন্দরবনের সমগ্র ম্যাপ দেখে এবং সূক্ষ্ম পর্যালোচনার মধ্য দিয়ে । জনবসতি থেকে খুব একটা দূরে নয় আবার শত্রুর জন্য দুর্ভেদ্য, এমনই অবস্থান ছিল সেটার। শত্রুপক্ষ গানবোট বা অন্য কোনো বড় ধরনের নৌযান নিয়ে সহজে এ এলাকায় প্রবেশ করতে পারত না। অথচ আমরা শত্রুর ওপর আক্রমণের জন্য বিভিন্ন জায়গায় অপেক্ষাকৃত সহজেই পৌঁছাতে পারছি। সব কারণ বিবেচনা করেই আমি গেরিলাদের মূল ঘাঁটি হিসেবে তেঁতুলবুনিয়া নদীর দু'পাশকে নির্বাচিত করেছিলাম। [পৃষ্ঠা-১৮৯]

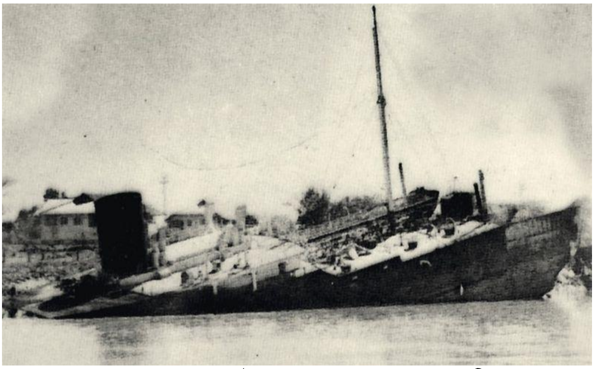

অপারেশ জ্যাকপটে ধ্বংসপ্রাপ্ত জাহাজের একটি

গেরিলা যুদ্ধ ও ঘাঁটি পরিচালনাসহ বিভিন্ন কাজে এসময় মেজর জিয়াউদ্দিন যাঁদের দায়িত্ব দেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন– সামসুল আলম তালুকদার, কবির আহমেদ মধু, হাবিলদার শহীদ আলাউদ্দিন, হাবিলদার সামশুল হক, হাবিলদার হাবিব, মোরেলগঞ্জের ছাত্রনেতা মোহাম্মদ আজিজ, মোহাম্মদ অবু, ক্যাপ্টেন আলতাফ, আবুল কালাম মহিউদ্দিন, এম,এ, আউয়াল, ডক্টর জাহাঙ্গীর, মোহাম্মদ আফজাল, হেমায়েত উদ্দিন বাদশা, বগীর নুরুল ইসলাম, মুজিবুল হক মজনু, শহীদ আসাদ, হেলাল, টিপু সুলতান, কামাল (মেজর জিয়াউদ্দিনের ছোট ভাই), মাজাহার উদ্দিন সিকদার, এ্যাডভোকেট সামশুল হক, বাবুল গাজী, হাবিলদার হাই, সুবেদার লতিফ, মোহাম্মদ হাবিবুল, সুবেদার গাফফার, সুবেদার ফুলু, শানু খন্দকার, বাবু পরিতোষ, শহীদুল আলম বাদল, হাবিলদার ফজলুল হক প্রমুখ। এছাড়া এই সাবসেক্টর হেডকোয়ার্টারে মেজর জিয়াউদ্দিনের ব্যক্তিগত সহকারী হিসেবে কাজ করতেন মোহাম্মদ হেলাল।

দেশত্যাগে নদীপথ

সুন্দরবন অঞ্চলে রাজাকারদের দৌরাত্ম্য বৃদ্ধি পাওয়ায় ও পাক হানাদারদের নির্মম অত্যাচার, নির্যাতনের ফলে সাধারণ মানুষ প্রাণ বাঁচাতে পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র

ভারতে আশ্রয় নেয়। এসময় নদীপথই হয়ে ওঠে তাঁদের প্রধান রোট। এপ্রিল মাসের দিকেই তাঁরা দেশত্যাগ করতে শুরু করেন। সুন্দরবনের মধ্যদিয়ে যাত্রার সময় তাঁরা পারেরহাট বন্দর থেকে কচা নদী, বলেশ্বর নদী, হরিণঘাটা নদী ব্যবহার করতেন। এসময় বিশ্রাম নিতেন সুন্দরবনের সুপতি নামক জায়গা, শাপলা খাল ও ক্ষুদিরামের খালের কাছে। বিশ্রাম শেষে তাঁরা শেলা নদী ধরে এগিয়ে মরা পশর নদী, শিবসা নদী, আড়পাঙ্গাশিয়া নদী ও মালঞ্চ নদী দিয়ে সীমান্তের ওপারে পশ্চিমবঙ্গে পৌঁছাতেন। সেদিন প্রাণভয়ে প্রিয় মাতৃভূমি ছেড়ে পালিয়ে যাওয়া আরও অগণিত অসহায় বাঙালির দলে ছিলেন মাত্র এগারো বছর বয়সী শিশু, মুক্তিযুদ্ধ গবেষক ও লেখক সত্যজিৎ রায় মজুমদার। তিনি শুনালেন সেই দিনের কথা– ছাই উড়ে আসছিল দুপুর বেলা। ৩ এপ্রিল সকাল ১০টায় গুলি হয়েছে মোংলায়। মোংলা থেকে ১০ মাইল উত্তরে আছি। তবু বাতাসে বিস্ফোরণের ধাক্কা গায়ে লাগে। একটানা গুলি হয়েছে দীর্ঘক্ষণ। বড় পুকুর পাড়ে গেলাম দুপুরে। বাম কোলে ছোট ভাই টুলু, ডান হাতে ধরা গুণ্ডা– সবচেয়ে ছোট ভাই, নেংটা। দক্ষিণা বাতাসে উড়ে আসা ছাই ধরতে লাগলাম। তা দেখে বলতে লাগলাম, 'ক্যারোলিন, সূতি, পলেস্টার।' বয়স এগারো। কী হতে যাচ্ছে কোনো ধারণা নেই মোংলা নদীপথ ঘুরে পাকবাহিনী প্রথম বাগেরহাটে আক্রমণ করেছিল ২৪ এপ্রিল। গানবোট থেকে সেদিনও গুলি হয়েছিল রামপালে। বৃদ্ধা এবং শিশুরা প্রচণ্ড গরমে নিরাপদ দূরের পথে নেমেছে। ভীষণ উত্তপ্ত রাস্তা। বাড়ি থেকে বের হয়ে তাদের দেখছিলাম। তারা অভিশাপ দিচ্ছিল। হিন্দু হয়েও বাড়িতে আরামে অবস্থান করতে পারছি বলে আমরা অবস্থান করছিলাম রামপাল থানার মালীডাঙ্গা গ্রামে। সদর থেকে পাঁচ মাইল উত্তরে। আমার মামাবাড়ি। বিধাতা মালী হয়ে সে গ্রামের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য রক্ষা করেছিলেন। বাড়ির সামনে বিশাল মাঠ। মাঠের মাঝে হরিতলা নামে ছাতার আকার এক বটবৃক্ষ। দক্ষিণে কালিতলা নামে আরও একটি বিশাল পুরোনো বটবৃক্ষের তলায় জীর্ণ মন্দির। গাছের কাণ্ডে অসংখ্য কোঠরে বড় বড় তক্ষকের বাস। পশ্চিমে আদিগন্ত খাল-বিল।

সমবয়সী মুসলমান বন্ধুরা হঠাৎ অন্যরকম হয়ে গেল। মুখে একটা কৃত্রিম হাসি বজায় রেখে আসছিল ঘন ঘন। গোয়াল থেকে গরু খুলে নিচ্ছিল। হাতে-মাথায় নিয়ে যাচ্ছিল যা খুশি। আমরা নিঃশব্দে চেয়ে দেখছিলাম।

রামপালে ৬ মে শান্তি কমিটি গঠনের মিটিং হল। উপস্থিত ছিল বাগেরহাটের রাজাকার নেতারা। ডা. মোজাম্মেল হোসেন, মোসলেম ডাক্তার, রজ্জব আলী ফকিরসহ কয়েক জন। তারা হিন্দু বিদ্বেষী বক্তব্য রেখেছিল। রজ্জব আলী ফকির সরাসরি ঘোষণা করে, 'গুলি করো আর হত্যা করো। ... আমি আজ সকালে চারটা খুন করে এসেছি। এই পরিস্থিতিতে আমি স্পষ্টভাবে একটি কথাই বলতে

চাই, দেশকে রক্ষা করতে হলে হিন্দুদের নিধন করতে হবে, বিতাড়ন করতে হবে।' মিটিংয়ে উপস্থিত ছিলেন বাড়ির পাশের যুবক ইসলাম মৌলভী। ফর্সা লম্বা নূরানি চেহারা। বিকালের দিকে বাড়ির পূর্ব পার্শ্বের জেলা বোর্ডের রাস্তা দিয়ে চীৎকার করে দৌড়ে আসেন তিনি– 'হিন্দুরা পালাও, আর রক্ষে নেই।' বাবা লক্ষ্য রেখেছিল মিটিংয়ের দিকে। খবর শুনে ঘরে এসে বললো, 'হাঁটো।' সেদিন বৃহস্পতিবার, বারবেলায় গৃহত্যাগ করলাম।

পরিবারে প্রতি সন্ধ্যায় প্রার্থনা হতো। গীতা ছিল আমাদের পরমাদর্শ। মনে হতো গীতার উপর শ্রদ্ধা-বিশ্বাস আমাদের রক্ষা করবে। যখনই বাড়ি ছাড়ার প্রশ্ন আসতো প্রত্যেকে একখানা করে গীতা সাথে নিতাম। ঝনঝনিয়া ইউনিয়নের চেয়ারম্যান সিদ্দিক আলী ভরসা দিয়েছিলেন– 'আমি থাকতে আপনাদের কোনো বিপদ হতে দেব না।' আমরা না পাচ্ছিলাম চলে যাওয়ার গতি, না থাকবার উপায়। ফর্সা ও সুন্দরী বড়দি রীতাকে নিয়ে দুশ্চিন্তা বেশি।

ঘর থেকে বের হয়ে দুই শরীকের মাঝখানে দাঁড়ালাম সবাই। কোথায় যাব? মুসলমানরা ধর্ম ত্যাগের উপদেশ দিয়েছেন। দিদিকে ইসলাম মৌলভীর সঙ্গে বিয়ে দিলে এ যাত্রা রক্ষা হয়। বাবা আমাদের বললো, গীতা ফেলে দাও। ওটা বোধ হয় আর লাগবে না। বোচকা থেকে গীতা বের করে ঘরে রেখে এলাম। তারপর ইসলাম মৌলভীর উঠোনে গিয়ে দাঁড়ালাম। নতুন কুটুম্বুর মতো যত্ন করছিল মহিলারা। তাদের মুখে একটা রহস্যময় হাসি ছিল। বাবার পিসি-শাশুড়ি খেপিদি– ক্ষেমঙ্করী বিশ্বাস সাহসী মহিলা। তার ভূমিকায় আমরা ইসলাম গ্রহণ এবং বিয়েতে না গিয়ে ভারতের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়লাম। পথ ছিল ওই দুটো– ভারতে যাও, না হলে মুসলমান হও। অনতি দূরে ভাগার মাঠে যেতেই চেয়ারম্যান সিদ্দিক আলী ছুটে এলেন। 'আজ অবর বেলায় যাবেন না। সকালে আমি পৌঁছে দিয়ে আসব।'

'চৈদার' ভিটের কাছে ফিরে আসতেই একদল লুটেরার সামনে পড়লাম। তাদের হাতে মামাবাড়ির সব তৈজষপত্র। ফিরে এসে বাড়িটা অচেনা মনে হল। খাঁ খাঁ করছে শূন্যতা। সকালে কিছু চাল-ডাল পাঠালেন চেয়ারম্যান। মা একটা মাটির হাড়ি সংগ্রহ করে তাতে একসাথে সব সিদ্ধ করলো। তাই খেয়ে আবার যাত্রা করি শুক্রবার সকালে। চেয়ারম্যানের ছোটভাই আবু তালেব একটা দোনালা বন্দুক হাতে সাথে হাঁটছেন। কোমরে কয়েকটা গুলির ব্যাগ। সাথে আরও দু'জন লোক।

দু'তিন গ্রাম পার হলে আবু তালেবরা ফিরে গেলেন। বাবা চোখের জলে বিদায় দিল তাদের। গ্রামগুলোতে লোকজন নেই। ভালো বাড়িগুলোতে বসে আছে দখলদাররা। তারা জানালা দিয়ে আমাদের দেখছিল। লুটেরাদের শক্ত করে

লুঙ্গি কাছা আটা। কিছু লোকের হাতে রাম দা, বড় ছুরিকা। পুকুরে ডুবে কাঁসা-পিতলের থালা-গ্লাস তুলছে। ভেজা গায়ে ছুটে ছুটে লুটের মাল বয়ে নিচ্ছে বাড়ি। পথে তাদের ছুটতে বাধা হওয়ার ভয়ে আমরা রাস্তার নিচে দিয়েও হাঁটছি।

পশুর নদীর তীরে মৈদাড়া গ্রামে পৌঁছলাম দুপুরে। ওপারে লাউডোব গ্রামে পাকবাহিনী প্রায় তিনশ ভারতগামী লোককে গুলি করে হত্যা করলো সেদিন। ফলে নদী পার হওয়া গেল না। দাদু দলহারা হয়ে অন্যদের সাথে ওপারে গিয়েও ভাগ্যক্রমে বেঁচে ছিলেন। বাধ্য হয়ে মৈদাড়া গ্রামে দাসের বাড়িতে থাকলাম দুই দিন। ভয়ে পালঙ্কের নিচে ঘুমালাম। গভীর রাতে মা আমার প্যান্ট খুলতে বললো। কোমরের রবার খুলে তার সাথে একটা বড় সোনার মালা দিয়ে সেলাই করল আবার ।

দুই দিন পর পশুর নদী পার হয়ে পৌঁছলাম চুনকুড়ি। সেখানকার চেয়ারম্যান অনন্ত মণ্ডলের বাড়িতে শত শত মানুষ। সকলে মাছ-মাংস রান্না করে খাচ্ছিল। পরদিন ভোরে চেয়ারম্যানের তত্ত্বাবধানে কয়েকশ নৌকায় চড়লাম হাজার হাজার শরণার্থী। ভাড়া জন প্রতি দেড়শ টাকা। শিবসা নদী জুড়ে আগে পিছে যতদূর চোখ যায় শুধু নৌকা। কোনো নৌকায় এক মহিলা উলুধ্বনি দিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে হাজার কণ্ঠে উলুধ্বনি।

এক সপ্তাহ পরে বদরতলার বাজারে নামলাম বিকালে। রাতে বাজারে অবস্থান করে ভোর ৪টায় যাত্রা করলাম। অনেক বৃদ্ধ-বৃদ্ধাকে ঝাঁকা-বাঁকে করে বয়ে নিচ্ছিল লোকজন। রাস্তার পাশে তেমন অনেককে বসে কাঁদতে দেখলাম। তাদের ফেলে গেছে আত্মীয়রা। এক রকম দৌড়ে বেলা ওঠার আগেই একটা বিপজ্জনক রাস্তা পার হলাম সবাই। ক্লান্তিতে শিশু এবং বৃদ্ধরা গড়িয়ে পড়ছিল। কিন্তু থামবার উপায় নেই।

সকাল আটটার দিকে ইছামতী পার হচ্ছি ১ জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৭ সাল। পাঁচ টাকা হারে খেয়া। সব পোটলাগুলো একত্রে মাত্র দুটি করল বাবা। কারণ তারও

সমপরিমাণ ভাড়া লাগবে। বাবা পায়ের কাদা ধুয়ে দিল নদীর জলে। চোখের জল ফেলে বললো, 'পাক মানে পবিত্র। পাকিস্তানের পবিত্র মাটিতে আর কোন দিন ফিরে আসব কি না জানি না!' নদীর অর্ধেক পাকিস্তান, অর্ধেক ভারত। হঠাৎ পেছন থেকে একখানা পাকিস্তানি নেভি আসতে দেখে গলা শুকিয়ে গেল সবার। সামনে থেকে ভারতীয় একখানা নেভি এসে পড়ায় সেখানা উলটে চলে গেল। টাকির বর্ডার পার হয়ে সমস্ত ক্লান্তি নেমে এলো। তবে স্বেচ্ছাসেবকরা বসতে দিল না। পাকবাহিনীর গুলির আওতার বাইরে যেতে হবে। এমন সময় প্রচণ্ড গুলির শব্দও শুনলাম। কিছুক্ষণ পর অনেক আহত ও রক্তাক্ত মানুষকে দেখলাম ধরাধরি করে নিয়ে আসছে। পেছনে যারা আসছিল তাদের উপর গুলি হয়েছে। আমরা টাকির আম বাগানে গিয়ে আস্তানা গেড়ে বসি। জমিদারদের পরিত্যক্ত বাড়ির আঙ্গিনা। ছেড়া মাদুর-কাঁথা বিছিয়ে পাশাপাশি দখল নিয়ে বসল অনেক পরিবার।

পশুর নদী

সুন্দরবন অঞ্চলের গুরুত্বপূর্ণ নদী পশুর-এ মুক্তিযুদ্ধের সময় সংঘটিত হয়েছে বেশ কিছু যুদ্ধ। যুদ্ধে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর পরাজয়ের মধ্য দিয়ে ত্বরান্বিত হয়েছে বাংলাদেশের বিজয়। সংঘটিত যুদ্ধে প্রাণপনে লড়াই করেছে বাংলার অসীম সাহসী বীর যোদ্ধারা। সেইসাথে পশুর নদীও হয়ে ওঠেছিল মুক্তিযোদ্ধাদের সহায়ক শক্তি।

কমান্ডো মো. খলিলুর রহমান 'মুক্তিযুদ্ধে নৌ-অভিযান' বইতে লিখেন– '১৫ আগস্ট মংলা বন্দরে প্রথম অভিযানে কমান্ডোরা যখন প্রমত্ত পশুর নদীর মাঝে জাহাজে মাইন লাগিয়ে অনেকে তীরে ফিরেছেন, অনেকে তীরে পৌঁছানোর জন্য প্রাণপনে চেষ্টা করছেন, তখন দিনের আলোতে জাহাজের ডেকে পাকিস্তানিদের বিক্ষিপ্ত পায়চারি স্পষ্ট চোখে পড়ে। পশুর নদীর বিশাল ঢেউগুলোকে গুঁড়িয়ে দিয়ে যখন মাইনের প্রথম বিস্ফোরণ ঘটে তখন ঘড়ির কাঁটা সকাল ছয়টা ছুঁয়ে গেছে। এরপর বিকট শব্দে একটির পর একটি বিস্ফোরণ ঘটতে থাকে। একই সাথে নদীর তীরে নিরাপত্তার জন্য অবস্থানকারী যোদ্ধাদের এল.এম.জি দুটিও গর্জে ওঠে। পশুর নদীর তীরে এক প্রলয়ঙ্করী অবস্থার অবতারণা হয়। শত্রু গানবোটগুলো আচমকা আক্রমণে হতবিহ্বল হয়ে প্রথমে সাগরের দিকে দ্রুত পালিয়ে যায়। বাণিজ্যিক জাহাজগুলো গুরুতরভাবে আক্রান্ত বুঝতে পেরে একটানা বিপদ সঙ্কেত বাজিয়ে উদ্ধারের জন্য S.O.S বার্তা পাঠাতে থাকে। পাকিস্তানি গানবোট চারটি স্তম্ভিত ফিরে পুনরায় বন্দরে ফিরে হেভি মেশিনগান থেকে নদীর পশ্চিম তীরে ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি চালাতে থাকে। নদীর তীরের গাছপালা, বাড়িঘর ঝাঁঝরা করে দেয়। মর্টারের শেলগুলো কমান্ডোদের মাথার ওপর দিয়ে ঘুরতে ঘুরতে এসে পানি ও ঘাসের মধ্যে লুটিয়ে পড়ে। একটি শেলের

বোমাও বিস্ফোরিত হয়নি। গ্রামের ভীত-সন্ত্রস্ত মানুষেরা ছুটে গ্রাম ছেড়ে পালাতে থাকে। এর মাঝে সব কমান্ডো অপেক্ষমাণ নৌকায় ফিরে দ্রুত স্থান ত্যাগ করেন। যুদ্ধ শেষে বন্দর থেকে দূরে কামারখোলা গ্রামের ভেতর একটি স্কুলে সবার সম্মিলিত হওয়ার জন্য পূর্ব থেকে নির্দেশ দেয়া ছিল। দু'একজন কমান্ডো যাঁরা উদ্ধারকারী নৌকায় আসতে পারেনি তাঁরা গ্রামের মানুষের সাহায্য নিয়ে অনতিবিলম্বে নির্দিষ্ট স্কুল গৃহে এসে পৌঁছেন। সকাল নয়টা। স্কুলটির সামনে অপেক্ষমাণ কমান্ডো যোদ্ধাদের ঘিরে শত শত মানুষে ভিড়ে জমে গেছে। গ্রামের মানুষ ক্লান্ত, শ্রান্ত যোদ্ধাদের আপ্যায়নের জন্য প্রচুর ডাব, নারিকেল, গুড়, মুড়ি যে যা পেরেছেন সাথে নিয়ে এসেছেন। আপনার সন্তানের মতো তাদের যৎসামান্য সামর্থ্য দিয়ে আপ্যায়ন করেন। তাদের অকৃত্রিম ভালোবাসা কমান্ডোদের হৃদয় ছুঁয়ে যায়। কিন্তু এখানে দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা নিরাপদ নয় ভেবে কমান্ডো দল ছয়টি নৌকা সমন্বিত হয়ে সুতারখালির উদ্দেশ্যে বিজয়ের গৌরব নিয়ে ফিরে চলেন।' [পৃষ্ঠা-১১৫-১৬]

ভারতীয় বাহিনীর গোয়েন্দা বিভাগের পরিচালক ভাইস অ্যাডমিরাল মিহির কে রায় (১৯৭১ সালে দায়িত্বপ্রাপ্ত) তাঁর 'ওয়ার ইন দ্য ইন্ডিয়ান ওশান' গ্রন্থে পশুর নদ সম্পর্কে লিখেন– 'নভেম্বর মাসের ১০-১১ তারিখে ১২ জন সাঁতারু গেরিলা ছিনতাই করা দুটি লঞ্চে চেপে পৌঁছান আকরাম পয়েন্টে। জায়গাটি হলো পশুর নদে ঢোকার মুখ। গেরিলাবাহিনীর মধ্যে ছিলেন কয়েকজন সাবেক নৌসেনা এবং কয়েকজন নতুন প্রশিক্ষিত সাঁতারু। মধ্য নভেম্বরে কুয়াশা নেমেছিল। কেড়ে নেওয়া একটি ৪০X৬০ বোফোর্স গান নিয়ে গেরিলাবাহিনী কুয়াশার মধ্যে লঞ্চ দুটি ভাসিয়ে দিল। এ রকম আবহাওয়ায় লঞ্চ দুটিকে শনাক্ত করা কঠিন।

সে সময় 'সেন্ট অ্যালবানস' নামের সাত হাজার টনি একটি ব্রিটিশ ফ্রেইটার পশুর খালে ঢুকতে শুরু করে। লঞ্চের মুক্তিযোদ্ধারা শুধু জাহাজটির আবছা সীমারেখাটি দেখতে পান এবং তৎক্ষণাৎ গুলি করা শুরু করেন। ভাগ্যক্রমে কেউ কোনো আঘাত পাননি।

সাঁতারু মুক্তিবাহিনীর অভিযানগুলোর ফলে পাকিস্তানি বাহিনীর কাছে বাইরে থেকে সরবরাহ ভীষণভাবে বাধাগ্রস্ত হচ্ছিল। বেশির ভাগ বিদেশি জাহাজ পূর্ব পাকিস্তানের বন্দরগুলো থেকে বিদায় নিয়েছিল এবং তারা আর এদিকে ভিড়ছিল না। তবে উচ্চ হারে যুদ্ধঝুঁকি প্রাপ্তির লোভে গ্রিস ও পানামার জাহাজগুলো সরবরাহ বহন অব্যাহত রেখেছিল। তারা তাদের জাহাজে পতাকাও ওড়াচ্ছিল।

সাঁতারু বাহিনী পশুর নদের প্রবেশপথে মাইন পেতে দিল। বিশেষ ধরনের মাইন, যাতে শিপ-কাউন্ট মেকানিজম ছিল। সম্ভবত মাইনটি তারা চুরি

করেছিলেন চিটাগাং অর্ডিন্যান্স ডিপো থেকে।' [সূত্র: শত্রু ও মিত্রের কলমে, সম্পাদনা- মতিউর রহমান, প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা]

শেলা নদীতে যুদ্ধ

সেপ্টেম্বর মাসের ২০ তারিখের দিকে কমান্ডার জিয়াউদ্দিনের কাছে খবর পৌঁছায় শেলা নদী হয়ে প্রচুর পরিমাণে খাদ্যবাহী জাহাজ ও গানবোট যাতায়াত করছে। এরপরই সিদ্ধান্ত হয় ঐসব নৌযান আক্রমণের। পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী গেরিলা বাহিনীর অর্ধশতাধিক সদস্য শেলা নদীর উত্তর তীরে অবস্থান নেয়। সেদিন পাকিস্তানী সেনা বহনকারী একটি স্টিমার এ পথ দিয়ে যাচ্ছিল। স্টিমারটি দেখা মাত্র গুলি শুরু করে মুক্তিযোদ্ধারা। স্টিমারটির ছাদে তৈরি থাকা বাংকারের আড়াল থেকে পাকিস্তানী সেনারাও পাল্টা গুলি ছুড়ে। পরিস্থিতি বুঝে পাকিস্তানীরা খুব দ্রুত স্টিমারটিকে ঐ স্থান থেকে সরিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের দৃষ্টির বাহিরে চলে যায়। অপারেশন সফল না হওয়ায় মুক্তিযোদ্ধারা নতুন পরিকল্পনা গ্রহণ করে। সুন্দরবন এলাকায় নৌযান চলাচলের সময় নদীর খাড়ির অংশ দিয়েই চলাচল করে, যাতে চরে আটকে না যায়। এই বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে সিদ্ধান্ত হয় তাঁরা শেলা নদীর খাড়ির পাশ দিয়ে যতো বড় বড় গাছ আছে, তাতে ওঠে নৌযান আক্রমণের জন্য অপেক্ষা করবেন, যাতে গুলি করা যায় সরাসরি স্টিমারের ছাদে। সে লক্ষে বাজার থেকে শতাধিক গামছা জোগার করা হয়। তারপর পরিকল্পনা অনুযায়ী জায়গা বুঝে বড় বড় গাছে ওঠে পড়েন তাঁরা। তারপর নিজেদের সেই গামছা দিয়ে গাছের সঙ্গে ভাল করে বেঁধে নেন। এমন সময়ই পাকসেনা বহনকারী একটি স্টিমারকে আসতে দেখা যায়। খাড়ির যে অংশের বড় গাছগুলোতে মুক্তিযোদ্ধারা অবস্থান নিয়েছেন, ঠিক সেখান দিয়েই স্টিমারটি চলতে থাকে। স্টিমারের ছাদে তখন প্রায় শতাধিক পাকসেনা অবস্থান করছিল। এমন সময় কাছে থেকেই পাকসেনাদের দিকে গুলি চালানো হয়। এতে প্রায় অর্ধশতাধিক পাকিস্তানী হতাহত হয়। এমন ঘটনায় পাকসেনারা আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। এই সময়ে ভরা জোয়ার থাকায় স্টিমারটি উত্তরদিকে সরে যায়, এবং কয়েকবার ঘুরপাক খেয়ে মংলার দিকে যেতে থাকে।

ধানসাগর খালের যুদ্ধ

সেপ্টেম্বর মাসের ২৪/২৫ তারিখে দিকে স ম কবীর আহমদ মধু ও আমজাদ আলী মল্লিকের নেতৃত্বে ১০-১২ সদস্যের একটি মুক্তিযোদ্ধার দল নৌকায় লোকালয়ের দিকে যাত্রা করে। মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের লোকজনের সাথে সাক্ষাৎ এবং প্রয়োজনীয় খাদ্যসামগ্রী সংগ্রহ করে সুন্দরবনে নিয়ে আসাই ছিল তাঁদের যাত্রার প্রধান উদ্দেশ্য। অনুমানিক রাত তিনটার দিকে ধানসাগর খালের কাছে অবস্থিত ফরেস্ট অফিসের কাছে আসা মাত্রই তাঁরা তিনটি নৌকায়

অবস্থানরত রাজাকারদের মখোমুখি হন। এসময় রাজাকারদের নৌকা থেকে তাঁদের দিকে গুলি ছুড়ে। সঙ্গে সঙ্গে তাঁরাও পাল্টা গুলি ছুড়েন। এতে স ম কবীর আহমদ মধুর নৌকার মাঝি গুলিবিদ্ধ হন। আর রাজাকারদের তিনজন ঘটনাস্থলে নিহত হয়। অন্যরা পালিয়ে যায়। সেদিন তাঁরা খাদ্যসামগ্রী সংগ্রহ না করেই ভোর হওয়ার আগেই ক্যাম্পে ফিরে আসেন।

নৌকার মাঝি আবুল হাশেম হাওলাদারের স্মৃতিচারণ

২০১৭ সালের ২ ডিসেম্বর দৈনিক কালের কণ্ঠ পত্রিকায় পিরোজপুরের কাউখালী উপজেলার জোলাগাতী গ্রামের মুক্তিযোদ্ধা আবুল হাশেম হাওলাদারের স্মৃতিচারণ প্রকাশিত হয়। সেখানে তিনি বলেন– 'হাসনাবাদ থেকে একদল মুক্তিযোদ্ধা ও অস্ত্রের চালান নিয়ে একদিন রওনা দিই সুন্দরবন অভিমুখে। তখন ভরা বর্ষাকাল, প্রমত্তা নদী। ঘোর অন্ধকার রাতে আমরা যখন নদীর মাঝখানে তখন ঝড় শুরু হয়। নৌকার মাঝি আমি। উথাল-পাথাল ঢেউয়ে শক্ত হাতে হাল ধরি। তুমূল বৃষ্টি আর বিদ্যুৎ চমকানোর মাঝে হঠাৎ মাঝ নদীতে পাকিস্তানি সেনাদের একটি গানবোট দেখতে পাই। মুক্তিযোদ্ধারা চমকে ওঠেন। শুরু হয় গোলাগুলি। মুহূর্তেই পাকিস্তানি সেনাদের একটি গুলি এসে আমার বাঁ হাতে লাগে। একটা আঙুল উড়ে যায়। সেই হাত দিয়েই শক্ত করে চেপে ধরি নৌকার হাল। পাক সেনাদের গুলি তখনও থামে না। মুক্তিযোদ্ধারাও পাল্টা গুলি চালায়। আর আহত আমি মরণপণ নৌকা চালিয়ে নিই। একপর্যায়ে থেমে যায় গোলাগুলি। কয়েক ঘণ্টার বিপদ কাটিয়ে আমি নৌকা পৌঁছে দিই ক্যাম্পের নিকট। এর পরই আমি জ্ঞান হারাই।'

এমন আরও ছোট-বড় অসংখ্য যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে সুন্দরবনের বলেশ্বর, ভোলা, নীলকমল, পশুড়, পাথুরিয়া, বাংরা, রায়মঙ্গল, মালঞ্চ, শিবশা, শেলা, হরিণঘাটা ইত্যাদি নদীর মধ্যে।

মুক্তিযুদ্ধের সময় এই অঞ্চলে যুদ্ধ করেন নৌসেনা লে. কমান্ডার (অব) জালাল উদ্দিন বীর উত্তম। তিনি তাঁর 'মুক্তিযুদ্ধে নৌ সেনানী' বইতে লিখেছেন- '৩০ জুলাই শেষ হয়ে যায় ঐতিহাসিক ক্যাম্পে অনুষ্ঠিত লিম্পেট মাইন ও হাতবোমা দিয়ে পূর্ববাংলার বিভিন্ন নদ-নদী; যেমন– পদ্মা, মেঘনা ও যমুনার বুকে নদীবন্দর এবং সমুদ্রবন্দর দুটিতে অপারেশন জ্যাকপট পরিচালনা করবার চূড়ান্ত প্রশিক্ষণ ও প্রস্তুতি। নৌ-কমান্ডো হিসেবে সমুদ্রবন্দর ও নদীবন্দরগুলোতে আত্মঘাতী আক্রমণে যাওয়ার জন্য, দেশমাতৃকার স্বাধীনতা অর্জনের জন্য আমরা আত্মঘাতী আক্রমণ (সুইসাইডাল এ্যাটাক) দলিলে স্বাক্ষর করি।

৭ আগষ্ট আমরা ১৪ জন নৌ-কমান্ডো চৌদ্দটি লিম্পেট মাইন, দুইটি এল.এম.জি, তিনটি এস.এল.আর, পাঁচটি ৩০৩ রাইফেল, চারটি এল.এমজি এবং

পর্যাপ্ত পরিমাণ গোলাবারুদ নিয়ে পিরোজপুরের বীর মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউদ্দিনের দিকনির্দেশনায় চব্বিশ-পরগনার বি.এস.এফ- ঘাঁটি থেকে বাংলাদেশের দ্বিতীয় সামুদ্রিক বন্দর চালনার বহিঃনোঙর ও হিরণ পয়েন্টে অবস্থানরত পাকিস্তানী ও বিদেশী জাহাজে অপারেশন জ্যাকপট পরিচালনা করার জন্য যাত্রা করি। মেজর জিয়াউদ্দিনও ২৪ পরগনার একই ঘাঁটি থেকে ছয়খানা দেশী নৌকায় বিপুল পরিমাণ অস্ত্র ও গোলাবারুদ নিয়ে বঙ্গপসাগরের উপকূল ও সুন্দরবনের মধ্যদিয়ে আমাদের নৌকাসহ অতি সাবধানতা অবলম্বন করে ১৪ আগষ্ট হিরণ পয়েন্টে জাহাজঘাঁটির কাছাকাছি পোঁছে অবস্থান গ্রহণ করতে সমর্থ হই।

১৪ আগষ্ট হিরণ পয়েন্ট নোঙরে নিজেদের অবস্থান থেকে তীক্ষ্ম ও সজাগ দৃষ্টি রাখতে থাকি। কারণ ১৪ আগষ্ট মধ্যরাতে কলকাতা বেতার কেন্দ্রের মাধ্যমে গোপন সংকেত প্রাপ্তির সাথে সাথে অপারেশন জ্যাকপট শুরু করতে হবে। কিন্তু ১৪ আগষ্ট পাকিস্তানের স্বাধীনতা দিবস ভেবে সবগুলো জাহাজ নিরাপত্তার জন্য ভেতরে নিয়ে যায়। ফলে হিরণ পয়েন্ট নোঙরে অপারেশন জ্যাকপট পরিচালনা সম্ভব হয়নি। তবে বন বিভাগের একটি জাহাজ আমরা ডুবিয়ে দেই এবং সহযোদ্ধা নৌ-কমান্ডোদের নিয়ে মেজর জিয়াউদ্দিনের নৌ-বহরের সাথে তাঁর শরণখোলা ও সুপতি ঘাঁটিতে চলে যাই। সেখানে গিয়ে জানতে পারি চালনা বন্দর নোঙর এলাকায় ১৪ আগষ্ট মধ্যরাতে যে দলটির অপারেশন করার কথা ছিল, তারাও আংশিকভাবে সফল হয়েছে। তারা 'লাইটিং থান্ডার' নামে একখানা সমুদ্রগামী জাহাজকে ঘায়েল করতে সক্ষম হয়েছে। যদিও তাদের টার্গেট ছিল আরও বেশি, কিন্তু সুযোগ না- পাওয়ায় তা সফল করা সম্ভব হয়নি। তবুও নৌ-কমান্ডোরা যে বীরত্বের পরিচয় দিয়েছে তা এক গৌরবময় অর্জন।' [পৃষ্ঠা-৩২-৩৩]

একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধে প্রাণপন লড়াই করেছে বাংলার দামাল ছেলেরা। একইসাথে সুন্দরবনের নদ-নদীগুলো বাঘের হিংস্রতায় গর্জে ওঠেছিল, পাকিস্তানীদের নির্মম অত্যাচার আর নিষ্পেশনের বিরুদ্ধে। যে কারণে এ অঞ্চলের মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য বেশ খানিকটা সহজতর হয়ে ওঠেছিল লড়াইয়ের ময়দান। জয় আসে, নদী পথে, নয় মাসে।♦

৯ ডিসেম্বর বেগম রোকেয়া দিবস
জন্ম : ৯ ডিসেম্বর ১৮৮০, মৃত্যু : ৯ ডিসেম্বর ১৯৩২

বেগম রোকেয়ার স্বপ্ন বাস্তবায়নে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

ড. মাহবুবা রহমান

বেগম রোকেয়ার জন্ম হয় এমন একসময় যখন গোটা ভারতীয় উপমহাদেশ ছিল নানা কুসংস্কারে আচ্ছন্ন। আর এসব কুসংস্কারের বিরাট অংশ ছিল নারী সমাজকে ঘিরে। নারী শিক্ষা, নারীদের ঘর থেকে প্রয়োজনে বের হওয়া ও সমাজের নানান কর্মকাণ্ডে নারীদের অংশগ্রহণ ইত্যাদিকে পাপ মনে করা হতো। অথচ ইসলাম নারী-পুরুষ সকলের জন্য জ্ঞানার্জনকে অত্যাবশ্যকীয় করেছে এবং শালিনতা বজায় রেখে প্রয়োজনে সামাজিক ও পেশাগত কর্মকাণ্ডে নারীর অংশগ্রহণকে সম্পূর্ণ অনুমোদন করেছে।

কাজেই আজকের যুগে অবস্থান করে বেগম রোকেয়ার অবদানকে উপলব্ধি করতে হলে আজ থেকে একশত বছরেরও বেশি সময় আগের সমাজ ব্যবস্থায় নারীর অবস্থান কোথায় ছিল, তা ভালো করে বুঝতে হবে। বেগম রোকেয়া ছিলেন নারী-শিক্ষার অগ্রদূত। তবে তৎকালীন মুসলিম সমাজে নারী-শিক্ষার পক্ষে কথা বলা ছিল রীতিমতো ভয়াবহ ব্যাপার। তবুও তিনি নারী শিক্ষার জন্য আজীবন সংগ্রাম করে গেছেন।

সেই সময় বেগম রোকেয়া সত্যিকার অর্থে একজন ইসলামী চিন্তাবিদ, সমাজসংস্কারক ও মহৎ শিক্ষাবিদের দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর সবচেয়ে বড়

অবদান হচ্ছে মুসলিম মহিলাদেরকে কুসংস্কারের অন্ধকার থেকে আলোতে টেনে আনা যাকে ইসলামের মূল শিক্ষা বলে মনে করা হয়।

তাই আমরা দেখতে পাই বেগম রোকেয়া তাঁর লেখনিতে নারী-পুরুষকে ইসলামের মৌল ধারার দিকে নিয়ে আসার জন্য আহ্বান করেছেন; দিকনির্দেশনা দিয়েছেন কিভাবে ধর্মকে হৃদয়ে ধারণ করে এগিয়ে যেতে হবে। তাঁর লেখনি দেখে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মাণ হয় যে, তিনি প্রচণ্ড আল্লাহ্‌ভক্ত এবং ইসলামের প্রতি পূর্ণ আস্থাশীল রমনী ছিলেন। অবরোধ-বাসিনীতে আমরা দেখতে পাই তিনি বিভিন্ন স্থানে মহান রাব্বুল আলামীনকে অত্যন্ত সম্মানজনক ভাষায় স্মরণ করেছেন; দুর্দশাগ্রস্ত নারী সমাজের মুক্তির জন্য মহান সৃষ্টিকর্তার নিকট সাহায্য প্রার্থনা চেয়েছেন।

কাজেই আমরা স্পষ্টই বুঝতে পারছি যে, বেগম রোকেয়ার স্বপ্ন ছিল বাংলার নারীদেরকে শিক্ষিত করে তোলা এবং সমাজে প্রতিষ্ঠিত করা। তাই তাঁর প্রবন্ধ, গল্প ও উপন্যাসের মধ্যে নারী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা এবং নারী-পুরুষের সমতাভিত্তিক সমাজ বিনির্মাণের কথা উঠে এসেছে। বেগম রোকেয়ার আদর্শ, সাহস এবং কর্মময় জীবন নারী সমাজের এক অন্তঃহীন প্রেরণার উৎস। নর এবং নারীর সমন্বয়ে গড়ে উঠে একটি জাতি। কাজেই একটি পুরুষের মতো যদি নারীরও শিক্ষার সুযোগ করে দেওয়া হয় এবং তার জন্য সমাজের সবরকম কাজ করার অনুকূল পরিবেশ থাকে; তাহলে সে তার যোগ্যতা ও দক্ষতার মাধ্যমে সমাজ, দেশ ও জাতির জন্য বিশেষ অবদান রাখতে সক্ষম হবে। তাই তাঁর স্বপ্নের চিন্তা-ভাবনাগুলো তিনি লেখনির মাধ্যমে সমাজের কাছে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন বার বার। আর বেগম রোকেয়া উন্নত জীবনের স্বপ্ন দেখতেন বলেই তাঁর চেষ্টা ছিল মেয়েদেরকে সামনের দিকে এগিয়ে নেয়া। এই জন্য তাঁর লেখনিতে তিনি অত্যন্ত সাহসের সঙ্গে মেয়েদের মাথা উঁচু করে চলার জন্য স্বপ্ন দেখাতে চেয়েছেন।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কন্যা শেখ হাসিনা একজন দূরদর্শী রাষ্ট্রনায়ক। তিনিও স্বপ্ন দেখতে এবং দেখাতে পারেন। ডিজিটাল বাংলাদেশের ভিশন– ২০২১, ২০৪১ বাস্তবায়িত হলে বাংলাদেশ উন্নত বিশ্বে পৌঁছে যাবে ইনশাআল্লাহ। তিনি জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মাথায় রেখে আজ থেকে শত বছর পরের নিরাপদ জীবন এবং দেশের অর্থনৈতিক চাকা সচল রাখার লক্ষ্যে 'বাংলাদেশ ডেল্টা প্ল্যান– ২১০০' বাস্তবায়নের নির্দেশনা প্রদান করেছেন।

বর্ণিত প্রেক্ষাপটে প্রতীয়মাণ হয় যে, বেগম রোকেয়া আজ থেকে শত বছর পূর্বে তাঁর নারীস্থানে শাসনকার্য পরিচালনায় জ্ঞান-বিজ্ঞানে উৎকর্ষতা অর্জন ও প্রসারণে যে দৃঢ়চেতা নারীশাসকের স্বপ্ন দেখেছিলেন, বাস্তবে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী

শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় কার্যক্রম পরিচালনাসহ নারীর ক্ষমতায়নে সে স্বপ্নের বাস্তবায়ন হয়েছে। নারীর ক্ষমতায়নের স্বপ্নে পৌঁছানোর লক্ষ্যে বাংলাদেশ প্রতিনিয়ত এগিয়ে যাচ্ছে, এগিয়ে যাবে বহুদূর।

বেগম রোকেয়া ও স্বামী সাখাওয়াত হোসেন

বেগম রোকেয়ার যেমন ছিল অসাধারণ এবং দূরদর্শি চিন্তাভাবনা যার প্রতিফলন দেখা যায় তাঁর রচনাবলীতে। বেগম রোকেয়ার সবচাইতে বড় স্বপ্ন ছিল নারীর ক্ষমতায়ন, নারী নেতৃত্ব, নারী স্বাধীনতা এবং নারী নির্যাতন প্রতিরোধ করা। এই চিন্তারই বিরাট প্রতিফলন ঘটেছে শেখ হাসিনার কর্মে। বিশ্ব আজ নারী নেতৃত্বে চলছে যেমন শেখ হাসিনা আজ বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী, তাঁর নেতৃত্বে দেশ পরিচালিত হচ্ছে। শেখ হাসিনার মধ্যে তাঁর পিতার মতোই অসাধারণ নৈপুণ্যের পরিচয় মেলে। বঙ্গবন্ধু রচিত অসমাপ্ত আত্মজীবনী এমন একটি সাহিত্যকর্ম যা পড়ে পাঠকসমাজ বিস্মিত। এই পুস্তকে যেসব নির্দেশনা আছে তা একটি স্বাধীন দেশ পরিচালনায় সাহায্য করবে কারণ স্বাধীনতা পাওয়া সহজ কিন্তু রক্ষা করা বড়ই কঠিন।

বাংলাদেশ নারী শিক্ষার প্রসার ও নারী-পুরুষের সমতাভিত্তিক রাষ্ট্র গঠনে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন পথিকৃৎ। তিনি বিশ্বাস করতেন দেশকে এগিয়ে নিতে হলে এবং সোনার বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করতে হলে নারীর সমান অধিকার নিশ্চিত করা ছাড়া সম্ভব নয়। তাই তিনি নারীর সমান অধিকার, সমমর্যাদা, সাম্য ও স্বাধীনতার অপরিসীম গুরুত্ব অনুধাবন করে সংবিধানে নারীর ক্ষমতায়নের শক্ত ভিত রচনা করেছিলেন।

তিনি জাতীয় সংসদে নারীদের জন্য আসন সংরক্ষিত রাখার বিধান করেন। ১৯৭৩ সালে তাঁর গৃহীত প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় নারীর জন্য শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা ও কল্যাণমূলক কর্মসূচি গ্রহণ করেন।

জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমানের সুযোগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাহসী পদক্ষেপ বাংলাদেশকে বিশ্ব মাঝে একটি উন্নত দেশ হিসেবে দাঁড় করাতে সক্ষম হয়েছে তাই বাংলাদেশকে বলা হয় তৃতীয় বিশ্বের আদর্শ মডেল। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন ছিল বাংলদেশের প্রতিটি মানুষের মুখে থাকবে অন্ন, থাকবে পরনে বস্ত্র, থাকবে আশ্রয় এবং থাকবে সুখ-স্বাচ্ছন্দ যেগুলো প্রতিষ্ঠা করতে প্রধানমন্ত্রীকে সারা দেশে উল্কার মতো ছুটে বেড়াতে হচ্ছে প্রতিটি মুহূর্ত। ধন্যি মেয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ওয়াজেদ।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নারীর সমঅধিকার নিশ্চিত করেন

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালে বাংলাদেশের সংবিধানে নারীর সমঅধিকার নিশ্চিত করেন। বাংলাদেশের নারী-পুরুষ আজ দেশের উন্নয়নে একসঙ্গে কাজ করার জন্য অঙ্গীকারাবদ্ধ। তাই বলতে হয়, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বেগম রোকেয়ার কর্ম ও আদর্শে উজ্জীবিত হয়ে জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অসমাপ্ত কাজগুলো বাস্তবে রূপ দিয়েছেন। তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রম এবং আন্তরিকতার জন্য নারীর ক্ষমতায়নে বাংলাদেশ এশিয়ার দেশগুলোর শীর্ষে। আর আমরা অর্জন করছি আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি ও সম্মাননা। নিম্নে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নগুলো একটির পর একটি তিনি কিভাবে বাস্তবে বাস্তবায়িত করেছেন এবং এখনও করছেন তার কিছু উদাহরণ তুলে ধরা হলো:

একবুক স্বপ্ন নিয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নিজেকে রাজনীতিতে নিয়োজিত করেছিলেন। তাঁর প্রধান দুটি স্বপ্ন ছিল– এক. বাঙালির জাতীয় মুক্তি বা স্বাধীনতা, দুই. মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তি।

এরপর পাকিস্তানি শাসন পর্বে (১৯৪৭-১৯৭১) শুরু থেকেই তিনি একই লক্ষ্যে আন্দোলন-সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েন। এভাবে ২৪ বছরের ব্যবধানে তাঁর নেতৃত্বে ১৯৭১ সালে ৯ মাসের সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা পায় স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ।

তাঁর দ্বিতীয় স্বপ্ন অর্থাৎ মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তি, তাঁর কথায়, 'দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটানো'র নতুন লড়াই। ১৯৭৫ সালের ২৫শে জানুয়ারি সে লক্ষ্যে তিনি একটি সর্বাত্মক উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন, যাকে তিনি 'দ্বিতীয়

বিপ্লব’ বলে অভিহিত করেন। দ্বিতীয় বিপ্লবের কর্মসূচি নিয়ে অগ্রসর হওয়ার প্রস্তুতিকালে সংঘটিত হয় ১৫ই আগস্টের হত্যাকাণ্ড।

শেখ হাসিনা শুধু বঙ্গবন্ধুর রক্তের উত্তরাধিকারীই নন, তাঁর আদর্শেরও উত্তরাধিকারী। তবে তাঁর চলার পথ আদৌ কণ্টকমুক্ত ছিল না। পিতৃহত্যার পর ৬ বছর তাঁকে নির্বাসনে বিদেশে কাটাতে হয়েছে। ১৯৮১ সালের ১৪-১৬ই ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত আওয়ামীলীগের কাউন্সিলে অনুপস্থিতিতে তিনি দলের সভাপতি নির্বাচিত হন। এরপর একই বছর ১৭ই মে তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন।

অবশেষে তাঁর নেতৃত্বে ২১ বছর পর নির্বাচনের মাধ্যমে আওয়ামীলীগ সরকার গঠনের সুযোগ পায়। শুরু হয় জাতির পিতার স্বপ্নপূরণ একের পর এক পদক্ষেপ গ্রহণ।

জাতির পিতার স্বপ্নপূরণে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

দারিদ্র্য হ্রাস : বঙ্গবন্ধুর সারাজীবনের অন্যতম স্বপ্ন ছিল ‘দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটানো’। মানুষের চরম দারিদ্র্য ছিল এক্ষেত্রে প্রধান অন্তরায়। শেখ হাসিনার সরকারের গৃহীত নানামুখী কর্মসূচি, যেমন কাজের বিনিময়ে খাদ্য, ভিজিএফ, দুঃস্থ, বিধবা, স্বামী পরিত্যাক্তা ও বৃদ্ধের মতো অসহায় মানুষের জন্য ভাতাসহ সামাজিক নিরাপত্তা, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন ইত্যাদির ফলে দারিদ্র্য সীমা হ্রাস পেয়ে বর্তমানে তা শতকরা ২০.৫ ও চরম দারিদ্র্য ১১.২ ভাগে নেমে এসেছে।

খাদ্যের স্বয়ংসম্পূর্ণতা : স্বাধীনতার পর খাদ্য চাহিদা মেটাতে বঙ্গবন্ধু সরকারকে প্রতিবছর গড়ে ২০-৩০ লক্ষ টন খাদ্য বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয়েছে। তখন জনসংখ্যা ছিল সাড়ে ৭ কোটি। ১৯৭৪ সালে দেশে দুর্ভিক্ষ পর্যন্ত দেখা দেয়, যাতে কয়েক হাজার মানুষ প্রাণ হারায়। খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি করে দেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করা ছিল বঙ্গবন্ধুর দ্বিতীয় বিপ্লবের আর একটি প্রধান লক্ষ্য। পরবর্তী সময়ে জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকায় খাদ্য ঘাটতির পরিমাণও বৃদ্ধি পায়। শেখ হাসিনার সরকারের গৃহীত নানা পদক্ষেপ, যেমন কৃষকের কাছে সার পৌঁছানো, সেচ ব্যবস্থা, কৃষি উৎপাদনে যন্ত্রের ব্যবহার, সহজশর্তে কৃষি ঋণ, উচ্চফলনশীল ধান, কৃষির বহুমুখীকরণ, কৃষিপণ্যের ন্যায্য মূল্য ইত্যাদি কারণে খাদ্য ঘাটতির বাংলাদেশ আজ খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ। বর্তমানে দেশের জনসংখ্যা ১৬ কোটির উর্ধ্বে। উল্লেখ্য, বঙ্গবন্ধু যেখানে বছরে কৃষি জমিতে ডবল ফসল উৎপাদনের কথা বলেছিলেন, সেখানে বর্তমানে ৩ বার ফসল উৎপাদিত হচ্ছে।

যমুনা নদীতে সেতু নির্মাণ : দেশের মঙ্গাকবলিত উত্তর অঞ্চলের সঙ্গে যোগাযোগ ও দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে যমুনা নদীতে পুল বা ট্যানেল নির্মাণ ছিল বঙ্গবন্ধুর একটি লক্ষ্য। এ ব্যাপারে সেই পাকিস্তান আমলে ১৯৬৮ সালে আওয়ামীলীগের কাউন্সিলে প্রস্তাব গৃহীত হয়। শেখ হাসিনার প্রথম সরকারের সময় ১৯৯৮ সালে জাপানের সহায়তায় যমুনা নদীতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সেতু নির্মিত হয়। এ সেতুর মাধ্যমে উত্তরবঙ্গের সঙ্গে এখন সরাসরি রেলসহ অন্যান্য যোগাযোগ চলছে। উত্তরবঙ্গের উন্নয়ন এখন চোখে পড়ার মতো; মঙ্গা বলতে কিছু আর সেখানে নাই।

দুর্নীতি রোধ : স্বাধীনতার পরপর সমাজের সর্বত্র দুর্নীতির ব্যাপক বিস্তার বঙ্গবন্ধুকে অস্থির করে তোলে, যা তাঁর প্রায় সকল বক্তৃতায় গুরুত্বসহকারে স্থান পায়। ১৯৭৫ সালে তাঁর দ্বিতীয় বিপ্লব কর্মসূচি গ্রহণকালে তিনি দুর্নীতি উচ্ছেদকে এক নম্বর এজেন্ডা হিসেবে ঘোষণা করেন। দুর্নীতির ব্যাপারে শেখ হাসিনাও কঠোর অবস্থান গ্রহণ করেছেন। দুর্নীতি দমন কমিশনকে অনেক শক্তিশালী করা হয়েছে। দুর্নীতি এখনও বড় চ্যালেঞ্জ, সন্দেহ নেই। তবে এর লাগাম অনেকটা টেনে ধরা সম্ভব হয়েছে। উল্লেখ্য, অতিসম্প্রতি ক্ষমতার অপব্যবহার ও অবৈধ সম্পদের মালিক হওয়ার তাঁর নিজ দলের সহযোগী সংগঠনের কতিপয় শীর্ষ নেতার বিরুদ্ধে রাজনৈতিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তাদেরকে স্ব স্ব পদ থেকে অব্যাহতি দেন।

ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে ছিটমহল বিনিময় : ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে পারস্পরিক ছিটমহল বিনিময়ের লক্ষ্যে ১৯৭৪ সালে মুজিব-ইন্দিরা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। তার ৪১ বছর পর শেখ হাসিনার সরকারের সময় ঐ চুক্তি অনুযায়ী উভয় দেশের মধ্যে ১৬২টি ছিটমহল বিনিময় কার্যকর হয়, যার মধ্যে ১১১টি (১৭ হাজার ১৬০ একর ভূমি) বাংলাদেশ এবং ৫১টি ছিটমহল (৭ হাজার ১১০ একর ভূমি) ভারত লাভ করে।

মিয়ানমার ও ভারতের সঙ্গে সমুদ্র সীমা নির্ধারণ : ১৯৭২ সালে বঙ্গবন্ধু সরকার ইন্টারন্যাশনাল মেরিটাইম বাউন্ডারি আইন পাশ করে। ভারত ও মিয়ানমারের সঙ্গে সমুদ্রসীমা নির্ধারণ সংক্রান্ত বাংলাদেশের যে সমস্যা ছিল, আন্তর্জাতিক আদালতের মাধ্যমে শেখ হাসিনার সরকারের সময় যথাক্রমে ২০১২ ও ২০১৪ সালে উভয় দেশের সঙ্গে ঐ সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধান হয়। ফলে মিয়ানমারের নিকট থেকে ১ লাখ ১১ হাজার ৬৬৩ বর্গকিলোমিটার এবং ভারতের নিকট থেকে ১৯ হাজার ৪শ' ৬৭ বর্গকিলোমিটার সমুদ্র এলাকার ওপর বাংলাদেশের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়।

সারা দেশে বিদ্যুৎ : দেশকে আত্মনির্ভরশীল হিসেবে গড়ে তুলতে বিদ্যুৎ সরবরাহ বৃদ্ধির আবশ্যকতা উপলব্ধি করে বঙ্গবন্ধু প্রতি থানায় বিদ্যুৎ পৌঁছানোর লক্ষ্য স্থির করেছিলেন। শেখ হাসিনার সরকারের আমলে বিদ্যুৎ উৎপাদন দেশে নজির সৃষ্টি করেছে। বর্তমানে দেশে বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ২০ হাজার মেগাওয়াট এবং শতকরা ৯৫ ভাগ মানুষ বিদ্যুৎ সুবিধা পাচ্ছে।

গ্রামীণ উন্নয়ন : বঙ্গবন্ধু গ্রামকেন্দ্রিক উন্নয়নে গুরুত্বারোপ করে ৬৫ হাজার গ্রামের প্রতিটিতে একটি করে বহুমুখী সমবায় প্রতিষ্ঠান পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন। শেখ হাসিনার সরকারও গ্রামীণ উন্নয়নে বিশেষ দৃষ্টি দিয়ে আসছে। গ্রামীণ পরিবেশ অক্ষুন্ন রেখে যাতে সেখানকার মানুষ শহরের মতো নাগরিক সুযোগ-সুবিধা পেতে পারে, সেজন্য ২০১৮ সালের নির্বাচনে আওয়ামীলীগের মেনিফেস্টোতে আমার গ্রাম আমার শহর শিরোনামে একটি কর্মসূচি অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

জনগণের দোরগোড়ায় স্বাস্থ্যসেবা : এ লক্ষ্যে সীমিত সম্পদের মধ্যেও বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার পর প্রতি থানায় একটি করে থানা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স প্রতিষ্ঠা করেন। গ্রামীণ জনগণের মাঝে স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের লক্ষ্যে শেখ হাসিনার সরকার প্রতি ৬ হাজার মানুষের জন্য একটি করে স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং সারা দেশে এরূপ ১৮ হাজার ৫শ কমিউনিটি ক্লিনিক ও ইউনিয়ন স্বাস্থ্যকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে দেশের সকল নাগরিককে স্বাস্থ্যসেবায় আওতায় নিয়ে আসার পরিকল্পনা তাঁর সরকারের রয়েছে।

নারীর ক্ষমতায়ন : বঙ্গবন্ধু চেয়েছিলেন দেশের প্রশাসন, উন্নয়নসহ সর্বক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ ও ক্ষমতায়ন। তাঁর পরিকল্পিত জেলা ও থানা এডমিনিস্ট্রেটিভ কাউন্সিলে নারীর প্রতিনিধিত্বের বিধান রাখা হয়। নিজ দলের অভ্যন্তরে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১৯৭৪ সালে আওয়ামী লীগের কাউন্সিলে বিভিন্ন ইউনিট থেকে নির্বাচিত কাউন্সিলরদের মধ্যে শতকরা ১০ ভাগ আসন তাদের জন্য সংরক্ষিত রাখা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। জাতীয় সংসদে নারীর

সংরক্ষিত আসন ১০ থেকে বৃদ্ধি করে ১৫ করা হয়েছে। শেখ হাসিনার সরকারের আমলে সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি, প্রশাসন সর্বত্র নারীর অংশগ্রহণ সর্বোচ্চতায় পৌঁছে, বিশ্বে যা আজ রোল মডেল হিসেবে পরিগণিত। জাতীয় সংসদে নারীর সংরক্ষিত আসন বর্তমানে ৫০ জনে উন্নীত করা হয়েছে। দেশে এমন কোন কর্ম পেশা নেই, সেখানে নারীর অংশগ্রহণ অনুপস্থিত। গার্মেন্টস্ সেক্টরে তাদের একচেটিয়া প্রাধান্য সকলেরই জানা।

স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ : দেশের উন্নয়নে স্যাটেলাইট প্রযুক্তির গুরুত্ব অনুধাবন করে যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশে চতুর্মুখী চ্যালেঞ্জের মধ্যেও বঙ্গবন্ধু ১৯৭৫ সালে চট্টগ্রামের বেতবুনিয়ায় ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্র স্থাপন করেন। এরই ক্রমধারায় ৪৩ বছর পর ২০১৮ সালে শেখ হাসিনার সরকার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডাভিত্তিক কেনেডি স্পেস সেন্টার থেকে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ উৎক্ষেপণের ব্যবস্থা করেন। এর মাধ্যমে বাংলাদেশ বিশ্বে ৫৭ তম স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণকারী দেশের স্থান লাভ করে। দেশের প্রয়োজন মেটানোর পাশাপাশি ব্যবসায়িক ক্ষেত্রেও এর ব্যবহার শুরু হয়েছে। বেতবুনিয়া ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা ছিল বঙ্গবন্ধুর সুদূর প্রসারী দৃষ্টির পরিচয়বাহী।

ভারসাম্যপূর্ণ পররাষ্ট্রনীতি : 'সকলের সঙ্গে বন্ধুত্ব, কারো সঙ্গে শত্রুতা নয়' বৈদেশিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের এ মৌলিক নীতি বঙ্গবন্ধু কর্তৃক নির্ধারিত। ৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, চীন, সৌদি আরবসহ যেসব দেশ এর বিরোধিতা ও পাকিস্তানের পক্ষ অবলম্বন করে, বঙ্গবন্ধু সরকার সেসব দেশের সঙ্গেও সম্পর্ক স্থাপন সচেষ্ট হয়। এর মধ্য দিয়ে আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধুর প্রজ্ঞা দৃষ্টিভঙ্গি পরিচয় মিলে। একই নীতি ও আদর্শ অনুসরণ করায় আজ শেখ হাসিনার নেতৃত্বে প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারত, চীন, সোভিয়েট ইউনিয়ন, ইউরোপিয় ইউনিয়নভুক্ত দেশ, যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, সৌদি আরবসহ মুসলিম প্রধান দেশ সবার সঙ্গে বাংলাদেশের সু-সম্পর্ক গড়ে উঠেছে, যা দেশের উন্নয়নের জন্য অত্যাবশ্যক।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা : জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন দেশের আলেম সমাজকে ঐক্যবদ্ধ করে একটি অভিন্ন প্লাটফর্ম থেকে কুরআন ও সুন্নাহর প্রচার ও প্রসার কার্যক্রম পরিচালনার উদ্দেশ্যে। প্রতিষ্ঠার পর থেকে এ প্রতিষ্ঠান দেশের সর্বস্তরের লেখক, গবেষক ও ইসলামী চিন্তাবিদগণের সম্মিলিত প্রয়াসে জাতি গঠনে মূল্যবান অবদান রেখে আসছে। কখনও কখনও এ ধারার ব্যত্যয় ঘটলেও এর কার্যক্রম এগিয়ে গেছে নিজস্ব গতিতে। ইসলামের সুমহান আদর্শ, শিক্ষা-সংস্কৃতি, ইতিহাস-ঐতিহ্যের প্রচার-প্রসার এবং উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে এ প্রতিষ্ঠানের অবদান আজ দেশে-বিদেশে স্বীকৃত ও সমাদৃত।

বিশ্ব এজতেমার জন্য টঙ্গিতে সরকারি জায়গা বরাদ্দ : তাবলীগ জামাত একটি অরাজনৈতিক সংগঠন। ইসলামের পথে দাওয়াত দেয়াই হচ্ছে এ সংগঠনের একমাত্র কাজ। এই সংগঠনটি যাতে বাংলাদেশে অবাধে ইসলামের দাওয়াতি কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারে এ উদ্দেশ্যে বঙ্গবন্ধু তাবলীগ জামাতের বিশ্ব এজতেমার জন্য টঙ্গিতে সুবিশাল জায়গা বরাদ্দ করেন। প্রতিবছর বিভিন্ন দেশ থেকে দাওয়াতি কাজে সংশ্লিষ্ট হাজার হাজার তাবলীগী ভাই এই জামাতে সমবেত হন। বঙ্গবন্ধু টঙ্গি বিশ্ব এজতেমার এ স্থানটি বরাদ্দ করেছিলেন বলেই এজতেমায় আগত লক্ষ লক্ষ মুসলিম এখানে সমবেত হয়ে কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করে দাওয়াতি কাজ পরিচালনার জন্য বিশ্বের নানা প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ার সুযোগ পাচ্ছেন।

ওআইসি সম্মেলনে যোগদান ও মুসলিম বিশ্বের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক : জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু মুসলিম বিশ্বের সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে ১৯৭৪ সালে লাহোরে অনুষ্ঠিত ইসলামী সম্মেলন সংস্থার (ওআইসি) অধিবেশনে যোগদান করেন। ওআইসি সম্মেলনে যোগদান করে ইসলাম ও বাংলাদেশ সম্পর্কে বঙ্গবন্ধু মুসলিম নেতৃবৃন্দের সামনে যে বক্তব্য তুলে ধরেন এতে আরবসহ মুসলিম বিশ্বে বাংলাদেশের ভাব-মর্যাদা সমুন্নত হয় এবং মুসলিম বিশ্বের নেতৃবৃন্দের সাথে সুদৃঢ় ভ্রাতৃত্বের বন্ধন গড়ে ওঠে।

জাতি হিসেবে মর্যাদা অর্জন : বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন খুবই আত্মমর্যাদাসম্পন্ন জাতীয় নেতা। বাংলাদেশ ও বাঙালী জাতিকে যাতে মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করা যায়, সেটি ছিল তাঁর নিরন্তর প্রচেষ্টা। এজন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন দেশের আত্মনির্ভরশীলতা অর্জন। বঙ্গবন্ধুর দ্বিতীয় বিপ্লবের কর্মসূচির অন্যতম লক্ষ্য ছিল তাই। তিনি প্রায়শই বলতেন, 'ভিক্ষুক জাতির কোন মর্যাদা নাই।' তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, বাংলাদেশ মর্যাদাশীল রাষ্ট্র হিসেবে একদিন বিশ্বে স্থান করে নেবে। তাঁরই কন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে একসময় 'তলাবিহীন ঝুড়ি' হিসেবে বিশ্বপরিসরে তিরস্কৃত বাংলাদেশ আজ (২০১৮) মধ্যম আয়ের দেশ হিসেবে জাতিসংঘের স্বীকৃতি অর্জন করেছে। বিশ্বের দ্রুত উন্নয়ন সম্ভবনার ৫টি দেশের মধ্য বাংলাদেশ অন্যতম।

বর্তমানে বিশ্বে বিচক্ষণ রাজনৈতিক নেতৃত্বের বড়ই অভাব

তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নকামী দেশের রাজনীতিতে সৎ, সাহসী, দুর্নীতিমুক্ত, জনগণের জন্য নিবেদিতপ্রাণ, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, আত্মপ্রত্যয়ী ও বিচক্ষণ রাজনৈতিক নেতৃত্বের বড়ই অভাব। সেক্ষেত্রে শেখ হাসিনা ব্যতিক্রম এবং তিনি নেতৃত্বের এসব গুণের অধিকারী। অতিসম্প্রতি 'পিপল্স্ অ্যান্ড পলিটিক্স' নামে একটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান বিশ্বের ১৭৩ জন সরকার ও রাষ্ট্রপ্রধানের ওপর গবেষণা

চালিয়ে শীর্ষ ৫ জন সৎ নেতার তালিকা প্রকাশ করেছে। এর মধ্যে শেখ হাসিনা ৩য় স্থানে রয়েছেন। এটি ব্যক্তিগতভাবে শুধু তাঁরই নয়, সমগ্র জাতির জন্যও পরম গৌরবের ও ভরসার স্থল। বিশ্বের ৫ জন সৎ নেতা হলেন– (১) জার্মানির চ্যান্সেলর অ্যাঞ্জেলা মার্কেল, (২) সিঙ্গাপুরের প্রধানমন্ত্রী লি সিয়েন লুং, (৩) বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, (৪) নরওয়ের প্রধানমন্ত্রী ইরস সোলবার্গ এবং (৫) ইরানের প্রেসিডেন্ট হাসান রুহানি।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিশ্বে এক রোল মডেল

শান্তি, গণতন্ত্র, ন্যায়বিচার ও মানবাধিকারের প্রশ্নে শেখ হাসিনার অবস্থান সর্বজনবিদিত। অভ্যন্তরীণভাবে তাঁর উদ্যোগ ও নেতৃত্বে তৃতীয় কোনো পক্ষের মধ্যস্থতা ছাড়াই ১৯৯৭ সালের ২রা ডিসেম্বর পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সঙ্গে তাঁর সরকারের স্বাক্ষরিত হয় ঐতিহাসিক শান্তি চুক্তি। এরপর থেকে পার্বত্য অঞ্চলে বিরাজ করছে শান্তি, যা ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁর এ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ১৯৯৯ সালে জাতিসংঘ সংস্থা ইউনেস্কো কর্তৃক তিনি শান্তি পদকে ভূষিত হন। নারীর ক্ষমতায়নে শেখ হাসিনা বিশ্বে এক রোল মডেল।

বাংলাদেশকে ঘিরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের যে গভীর বিশ্বাস ও স্বপ্ন ছিল, তাঁরই কন্যা বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ সে লক্ষ্য পূরণে দৃঢ় পদে এগিয়ে যাচ্ছে। ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ যে একটি উন্নত সমৃদ্ধ দেশে পরিণত হবে, এ নিয়ে এখন আর কারো সংশয়-সন্দেহ নেই।

সামগ্রিকভাবে বঙ্গবন্ধুর ব্যক্তিক ও আদর্শিক ছায়াতলে বেড়ে ওঠা শেখ হাসিনা নিজগুণে বাংলাদেশের রাজনীতিতে তাঁর নেতৃত্বের একটি স্বতন্ত্র অবস্থান করে নিতে সক্ষম হয়েছেন। শুধু বাংলাদেশেই নয়, বিশ্বরাজনীতির পরিমণ্ডলেও তিনি আজ নেতৃত্বের মর্যাদার আসনে আসীন।

সেই যুগের মহীয়সী বেগম রোকেয়ার সুযোগ্য স্বপ্নোত্তরসূরি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নারী জাগরণ-নারী অধিকার প্রতিষ্ঠার কার্যকর মানবী মানস কন্যা, বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা যাঁর করুণার হাত শুভ সুন্দর শান্তি আর মানবতার জন্য দৃঢ় প্রসারিত। যার সাহসী সিদ্ধান্তে নারী মুক্তি অগ্রগতি উন্নয়নই শুধু নয় আজ বাস্তব কার্যকর নারীর ক্ষমতায়ন, নারীর সম্মান মর্যাদা। আজ আমরা রাষ্ট্রীয় জাতীয় জীবনে দেখতে পাই বেগম রোকেয়ার স্বপ্নের বাস্তবায়ন।

এখানে উল্লেখ করা যায় যে, আজকে বাংলাদেশের রাষ্ট্র পরিচালনায় প্রায় তিন (০৩) দশক নারী নেতৃত্ব রয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, স্পিকার, বিরোধী দলীয় নেত্রী এবং মন্ত্রী পরিষদের সদস্যসহ ৭০ জন নারী সাংসদ রয়েছেন। এছাড়া সিটি কর্পোরেশনের মেয়র থেকে শুরু করে জেলা পরিষদ, ইউনিয়ন পরিষদ সর্বত্রই নারী জনপ্রতিনিধির নেতৃত্বে বিরাজমান। বর্তমানে নারীগণ জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল শাখাতেই শিক্ষালাভের পাশাপাশি বিভিন্ন চ্যালেঞ্জিং পেশায় নিয়োজিত থেকে সাফল্য অর্জন করছেন। একদিকে যেমনি বিচার বিভাগে মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের এ্যাপিলেট বিভাগে নারী বিচারপতি কর্মরত রয়েছেন, তেমনি নির্বাহী বিভাগে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সচিব, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের উপাচার্যসহ বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর, বিভিন্ন সংস্থাপ্রধান, জেলা প্রশাসক, পুলিশ সুপার প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ পেশাসহ সকল ধরনের চাকুরিতে নারী আজ অত্যন্ত সফলতার সাথে দায়িত্ব পালন করেছেন। বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০০০ সনে প্রথম সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীতে নারী কর্মকর্তা নিয়োগ দিয়েছেন। সেই থেকে নারী সামরিক কর্মকর্তা তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে অসাধারণ দক্ষতা প্রদর্শন করেছেন। এমনকি জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনেও তিন বাহিনীর বিভিন্ন পর্যায়ের নারী সদস্য নিয়োজিত থেকে বিদেশের মাটিতে গৌরবোজ্জ্বল অবদান রাখছেন। বর্ণিত প্রেক্ষাপটে প্রতীয়মান হয় যে, বর্তমানে রাজনীতিতে এবং বিভিন্ন পেশায় নারীর প্রবেশের ফলে রাষ্ট্র পরিচালনা ও কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে বেগম রোকেয়ার স্বপ্নপূরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশের নারীরা পৌঁছে গেছে।

সমাজসংস্কার ইতিহাস বিনির্মাণে যুগে যুগে কালে-কালে যে নারীরা ভূমিকা রেখেছেন, এই পবিত্র মাটিকে রক্তঘামে প্রজ্ঞায় চিন্তনে এগিয়ে নিয়ে গেছেন– মহাকালের মহীয়ষী নারী রাবেয়া বসরী, বাংলার রানী রাজিয়া সুলতানা, প্রীতিলতা ও যোদীর বেগম রোকেয়ারা তাঁদের সুযোগ্য উত্তরসূরিদের আমরা দেখি সাতচল্লিশে উজ্জীবিত, বাহান্নের ভাষা আন্দোলনে উদ্দীপ্ত একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধে উচ্ছ্বসিত। আজ বাংলাদেশের মেয়েরা হিমালয় জয় করেছেন– ক্রিকেট-

ফুটবল-ভলিবল-হাডুডু-সাঁতার-শুটিং নানা কর্মকাণ্ডে সাফল্য অর্জন করেছেন এটিই সংস্কৃতিমনা সাহিত্যবোনা এই রাষ্ট্র নায়কের উদার আন্তরিকতার কারণে। তাই আজ মহান সংসদে নারীর অধিকার সম্মান স্বীকৃতি মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় আইন (বিল পাশ) হয়েছে। কঠিন হস্তে নারী নির্যাতন-নারী পাচার-নারী শ্রমবৈষম্য দূর করে বন্ধন ও বন্টনের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। আজ আর নারী অসহায়-দুর্বল নয়। আজ আর নারী পরমুখী-ঘরমুখী নয়-অক্ষম-অসাড় নয় আজ শিল্প কারখানা-ব্যবসা প্রতিষ্ঠান অফিস-আদালতে কর্মক্ষেত্রে পরিশ্রমী-স্বাবলম্বী-আত্মনির্ভর এখানেই সৃষ্টির জয়, সভ্যতার বিজয়-মানবতার উৎসব সমতার আনন্দ সঙ্গীতে মুখর স্বাধীন-সার্বভৌমত্ব বাংলাদেশ আজ নারী কুসংস্কার-কূপমণ্ডূকতা-অন্ধত্ব-মৌলবাদী-ফতোয়াবাজীর বিরুদ্ধে সোচ্চার সচেতন সাহসী হয়েছে এটিও তৈরি করে দিয়েছেন জননেত্রী শেখ হাসিনা সেই মহাকালে উত্তরসূরিদের মন্ত্রমুগ্ধ অনুপ্রেরণায়।

ক্ষুদ্র জাতিসত্ত্বার মানুষেরা আজ ধর্ম-কর্মশিক্ষা-খাদ্য-বস্ত্র-চিকিৎসা সমভাবে পায়, আজ তারাও অবদান রেখেছে– দেশগঠন দেশপ্রেম উন্নয়নে। আজ শিশুরা বেড়ে ওঠা একাত্তরের চেতনায় জাতি পরিচয়ে ভাষায় বাঙ্গালী হয়ে। নিরাপদ-নিশ্চিত-সুরক্ষিত বাংলাদেশ। আর এই ছাপ্পান্ন হাজার বর্গমাইলের এই বাংলাদেশকে জলসীমায় আন্তর্জাতিক আদালতে রায়ে স্বাধীকার প্রতিষ্ঠিত করেন আরেক বাংলাদেশ-সাগর হৃদয় বঙ্গনেত্রী শেখ হাসিনার সাহসী উদ্যোগ, সিদ্ধান্তে অর্জিত হয়-সমুদ্র বিজয়। বৈদেশিক কূটনৈতিক আস্থা অর্জন-সহাবস্থান-বৈদেশিক সাহায্য-সমৃদ্ধি সারাদেশে জলে-স্থলে-বনায়ন-আবাসনে পথ-ঘাট-হাইওয়ে, মেট্রোলাইন, সেতু-কালভার্ট-ব্রীজ-ফ্লাইওভার দেশের যোগাযোগসহ সার্বিক উন্নয়নে নারীরা আজ পুরুষের সমতলে মানুষের সর্বমর্যাদায় আজ ইট ভাঙে-গাছ কাটে-পাথর ভাঙে-লোহা পোড়ায়-ঘর বানায়-রাস্তা বানায়-বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলায়। কোথায় নারী নেই?

প্রগতির পথে প্রাণের স্বতঃস্ফূর্ততায় রোকেয়ার আদর্শে উদ্বুদ্ধ সকল নারীকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। তাঁর প্রেরণা সকল নারী-পুরুষের অন্তরে জ্বলজ্বলে ধ্রুবতারা হয়ে জ্বলুক নিরন্তর। আজ বাংলাদেশের প্রতিটি দিনই কৃতজ্ঞ বীর বাঙ্গালী মহীয়সী নারী জাগরণের পথিকৃৎ বেগম রোকেয়া শাখাওয়াত হোসেনকে স্মরণ করে। বাংলাদেশের প্রতিটি নারীই শ্রদ্বাভরে, তাঁকে স্মরণ করে।

বর্তমান সদাশয় বাংলাদেশ সরকার বেগম রোকেয়ার স্বপ্ন বাস্তবায়নে আন্তরিকভাবে কাজ করছেন। নানা প্রকল্প গ্রহণের মধ্য দিয়ে নারী শিক্ষা প্রসার ও নারীর দুঃখ-দুর্দশা লাঘব করে রোকেয়ার স্বপ্ন বাস্তবায়নে সরকারের প্রয়াস অব্যাহত আছে। যার সুফল বাংলাদেশের নারী সমাজ ভোগ করছেন। বেগম

রোকেয়া আমাদের আদর্শ। আমাদের নিরন্তর পথ চলার প্রেরণা। আমাদের হৃদয়ে সবসময় ফুল হয়ে ফুটে থাকে তাঁর উজ্জ্বল মুখ।

নারীকে স্বাধীন মানুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার জন্য বেগম রোকেয়া লেখনির মাধ্যমে সমাজসংস্কার করতে চেয়েছেন শুধু তা নয়, তিনি স্কুল প্রতিষ্ঠা করে ঘরে ঘরে গিয়ে ছাত্রীও সংগ্রহ করেছেন। তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল নারীকে শিক্ষিত করে তোলা– তাকে প্রজ্ঞা, মেধা, মননে যোগ্য করে তার অধিকার সম্পর্কে সচেতন করা এবং নারী যেন অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জন করে, সেই লক্ষ্যে বেগম রোকেয়া বলেছেন নারী শিক্ষার কথা। আমাদের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও নারী শিক্ষার উপর গুরুত্ব দিয়েছেন এবং নারীদের জন্য স্নাতক পর্যন্ত শিক্ষা অবৈতনিক করার পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। কন্যা শিশুদের শিক্ষায় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে উপবৃত্তি প্রদান নিশ্চিত করেছেন। নারী শিক্ষাবৃদ্ধি, নারী-পুরুষের মধ্যে শিক্ষার হার ও সুযোগের বৈষম্য দূর করা এবং উন্নয়নের মূলধারায় নারীকে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে নীতিমালা গ্রহণ করেন। এছাড়াও শিশু ও নারী সমাজকে কারিগরি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিসহ সকল বিষয়ে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের উপরে গুরুত্ব দেন।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সব সময় বলে থাকেন, 'ভিক্ষুকের জাতির কোনও মর্যাদা নেই। এই পরিচয় আমাদের ঘোচাতে হবে। অনাদান-খয়রাত-বিচ্ছিন্ন উন্নয়ন নয় আমাদের আনতে হবে সার্বিক উন্নয়ন। নীচের তলা থেকেই এই উন্নয়নটা শুরু করতে হবে যাতে দুঃস্থ, অসহায় দরিদ্র মানুষ শক্তি অর্জন করতে পারে।' একারণে তিনি তার সরকার পরিচালনায় আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সবার আগে স্থান দিয়েছেন নারী ও প্রতিবন্ধীদের। নারীর ক্ষমতায়নকে তিনি স্বীকৃতি দিয়েছেন সর্বক্ষেত্রে এবং খুব কঠোরভাবে। দেশে উপকারভোগী নারীর সংখ্যা বর্তমানে ১৫ লক্ষ এবং নানা মাত্রায় অর্থ উপার্জনকারী নারীর সংখ্যা এক কোটিরও বেশি।

একুশ শতাব্দীর নারী আজ প্রযুক্তি ব্যবহারে ঘরে-বাইরে সকল ক্ষেত্রে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে সমর্থ হয়েছে। তার 'আপন ভাগ্য জয় করিবার অধিকার' কেউ কখনও কেড়ে নিতে পারবে না এবং পারতে দেয়া হবে না। আমরা জানি, মহীয়সী রোকেয়ার স্বপ্ন ছিল শিক্ষা ও অর্থ উপার্জনের মধ্য দিয়ে নারীর অর্থনৈতিক স্বাবলম্বিতা, সুফিয়া কামালের আন্দোলন ছিল বৈষম্য ও নির্যাতন দূর করে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা। আর তারই ধারাবাহিকতায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নারীর ক্ষমতায়নের পথটি সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা করে দিলেন। এটাই হলো বাংলাদেশের নারীর অগ্রগতির চমৎকারিত্ব।

বাংলাদেশের নারী মেধা ও প্রতিভা বিকাশের সাধনায়, শ্রমশক্তি ও দক্ষতার যোগ্যতায় পরীক্ষিত, মমত্ব ও আন্তরিকতায় নারীত্বের মর্যাদায় মানবিক। বেগম রোকেয়ার স্বপ্ন চিন্তার ধারাবাহিক বাস্তবায়নই আজকের বাংলাদেশ, আজকের সুশিক্ষিত বাঙালী নারী সমাজ যারা সুগৃহিণী, সুজননী ও সুনাগরিক।

বাংলাদেশের নারী বহির্বিশ্বে রাজনীতিতে

দেশে এবং দেশের বাইরে বাংলাদেশের নারী বহির্বিশ্বে রাজনীতিতেও প্রতিযোগিতায় জয়ী হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ পদে স্থান করে নিচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্র থেকে প্রকাশিত ফোবর্স ম্যাগাজিনে বিশ্বের ক্ষমতাধর ১০০ নারীর তালিকায় বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে বিশ্বের ৩৬ নম্বর ক্ষমতাধর নারী হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। আর ২০১৯ সনে ঐ একই ম্যাগাজিনে শেখ হাসিনাকে ২৯ নম্বর ক্ষমতাধর নারী হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বহু চড়াই-উৎরাই, দুঃখ-বেদনার কঠিন পথ, আগুনের পথ অতিক্রম করে দৃঢ়প্রত্যয়ী লৌহ মানবী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে এই সফলতা অর্জন করতে হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে বাংলাদেশের সকল প্রত্যয়দীপ্ত নারীর পক্ষ থেকে সংগ্রামী সালাম জানাই।

বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে এখন প্রযুক্তির ছোঁয়া বাংলাদেশে। যার ফলে কম্পিউটার/ল্যাপটপ ডিজিটাল/ আধুনিক সভ্যতার উন্মুখ, স্বপ্ন এখন প্রজাপতির পাখায় পাখায়। যার সুদক্ষ পরিচালনায় সুশাসন, ডিজিটাল বাংলাদেশ, কৃষিখাতে উৎপাদন বৃদ্ধি, উন্নয়নে গতিশীলতা, শিশু স্বাস্থ্য, শিশুশ্রম রোধ শিশুবিকাশের যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ নারী নির্যাতন, নারীর প্রতি সহিংসতা রোধে কঠোর আইন প্রণয়ন, নারীর দক্ষতা যোগ্যতা অর্জনে এবং নারীর ক্ষমতা সুনিশ্চিতকরণ, নারী ও পুরুষের সমাধিকার নির্মিতপূর্বক মর্যাদার পূর্ণপ্রতিষ্ঠাকরণ, কর্মসংস্থার সৃজন, খাদ্য নিরাপত্তা, বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধি, সর্বত্রই এই প্রজাপতির কর্মবিচরণ-শক্তি তার ইতিহাসের বেগম রোকেয়া, সুফিয়া কামাল থেকে বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিব পর্যন্ত প্রেরণার বাতিঘর-যেখান থেকে চেতনার জোনাক আলোয় আলোয় পথ দেখায়। গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে, শহর থেকে দূরে কোথাও দেশ থেকে দেশান্তরে– কি আকুতো সম্ভাষণ ভালোবাসার পুষ্পবিলাস আর স্বীকৃতি ও প্রশংসার আকাশচুম্বি পুরস্কার ও উপহার এসব কিছু আমাদের সেই ভালোবাসা, আদরের ও অহঙ্কারের রঙ্গিন পাখার প্রজাপতির, যার পাখায় পাখায় আমাদের স্বপ্ন আঁকা–কেন না ৩০ লাখ মা-বোনের সম্ভ্রমের বিনিময়ে বিনির্মিত বাংলাদেশ।

তাই এইসব স্বপ্নের বাস্তবায়নে যে মানবাধিকার ও নিরাপত্তা দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে তার সেই স্বপ্নদ্রষ্টা প্রজাপতির নাম শেখ হাসিনা, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক শেখ মুজিবুর রহমানের আদরের দুলালী গণপ্রজাতন্ত্রী

বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী-প্রজন্মের কিংবদন্তী। আমাদের অহঙ্কার, বেগম রোকেয়ার আদর্শের কাছে যার অঙ্গীকার। এই স্বপ্ন পাখায় বাংলার নারী সমাজের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও মানবিক মুক্তি নিশ্চিত।

বেগম রোকেয়া সুলতানার স্বপ্ন বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, তিনি শুধু যে নারীশিক্ষার জন্যই চেষ্টা করে গেছেন, নারীকে জাগাতে চেয়েছেন, এমনটিই নয়। তিনি অত্যন্ত আধুনিক এবং বিজ্ঞানমনস্ক ছিলেন। তিনি অনেক সুন্দর একটি দেশের কল্পনা করে গেছেন। স্বপ্নবুনে গেছেন, যেখানে কোনো অকালমৃত্যু হবে না। যেখানে মানুষ, 'নারী-পুরুষ' হিসেবে নয়, দু'জনেই মানুষ হিসেবে কাজ করবে। কেউ কাউকে অবমূল্যায়ন করবে না। যার-যার জায়গা থেকে কাজ করবে। শারীরিক শক্তি এবং বুদ্ধিমত্তা দু'টিকেই কাজে লাগিয়ে একটি দেশকে কীভাবে সুখের স্বর্গরাজ্যে পরিণত করা যায়, সেই স্বপ্ন রচনা করে গেছেন। কার্যত এই 'সুলতানার স্বপ্ন' কল্পকাহিনীটিকে আমরা আধুনিক 'সাইন্স ফিকশনের' সাথে তুলনা করতে পারি। কারণ, বেগম রোকেয়া যুগের চেয়ে অনেক বেশি বিজ্ঞানমনস্ক ছিলেন, আধুনিক চিন্তাশীল ছিলেন। তিনি সেই সময়েই বসে সৌররশ্মির ব্যবহার করে সংসারের দৈনন্দিন কাজ সম্পন্ন করার কথা চিন্তা করতে পেরেছেন। সৌর রশ্মিকে যুদ্ধে জেতার জন্য অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করার পাশাপাশি মাঠের ফসল ফলানোর কাজে ব্যবহারের চিন্তা করেছেন। বৃষ্টির পানিকে নিয়ন্ত্রণ করে প্রয়োজনমতো ব্যবহারের চিন্তা করেছেন। আজকে কিন্তু বর্তমান বিশ্বে, ঠিকই সৌররশ্মির ব্যাপক ব্যবহার হচ্ছে। বৃষ্টির পানিকে নিয়ন্ত্রণ করে আমরা আমাদের দৈনন্দিন কাজে ব্যবহার করতে পারলে আমাদের বৈদ্যুতিক যে চাহিদা আছে, বিদ্যুতের যে অভাব আছে, তার অনেকটাই আমরা নিরসন করতে পারি। একজন নারী হয়ে, প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় উচ্চশিক্ষা লাভ না করেও নিজের চেষ্টায়, নিজের চিন্তা-চেতনা দিয়ে নিজেকে প্রস্তুত করতে তিনি পেরেছিলেন। তিনি চিন্তাধারায় নিজেকে আধুনিক করতে পেরেছিলেন বলেই এ ধরনের স্বপ্নবুনতে সমর্থ হয়েছিলেন। যা আজকে আমরা আমাদের বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মাঝে বিদ্যমান পাই। তাঁকে বেগম রোকেয়ার স্বপ্নদেখা রাষ্ট্রনায়কের প্রকৃষ্ট উদাহরণ হিসেবে দেখতে পাই। রোকেয়ার সুলতানার স্বপ্নে'র রাজ্যের মহারাণীর স্বপ্ন, আর আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কর্ম যেন এক মিলনবন্ধন তৈরি করেছে। তিনি যেন রোকেয়ার স্বপ্নের প্রতিচ্ছবি এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাঁর স্বপ্নের চেয়েও অনেক বেশি অগ্রগামী। যেমন উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করতে পারি, ভবিষ্যতের বাংলাদেশের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও স্বপ্ন বুনছেন। তিনি ইতোমধ্যে ২০২১ সালের রূপকল্প, ২০৪১ সালের উন্নত বাংলাদেশ এবং ২১০০ সালের ডেল্টা প্ল্যান তৈরি করেছেন।

ভবিষ্যতের বাংলাদেশ কেমন হবে? কেমন করে এগিয়ে যাবে? কেমন করে নেতৃত্বে দেবে? তিনি সে স্বপ্ন রচনা করে যাচ্ছেন। পরিকল্পনা প্রণয়ন করে দিয়েছেন বাস্তবায়নের জন্য। একুশ শতকের বাংলাদেশকে তুলে দিয়েছেন আগামী প্রজন্মের হাতে। সবকিছু মিলিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং তাঁর পূর্বসূরি স্বপ্নদ্রষ্টা বেগম রোকেয়ার কাছে আমরা আজীবনের জন্য ঋণী হয়ে রইলাম।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিশ্বজুড়ে বিশ্বময়ী

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বেগম রোকেয়ার আদর্শ ও কর্মময় জীবনের মূল্যায়ন করতে করতে কখন যে তিনি বিশ্বজুড়ে বিশ্বময়ী হয়েছেন তা তিনি নিজেও জানেন না। তাঁর সকল সফল কাজের স্বীকৃতি হিসেবে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, বিশ্বসংস্থা, আন্তর্জাতিক সংগঠনের দেয়া ডিগ্রী, পদক ও সম্মান অনেক আন্তর্জাতিক পুরস্কারও তিনি পেয়েছেন। যেমন– ১৯৯৭ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বোস্টন ইউনিভার্সিটি থেকে ডক্টর অব ল ডিগ্রী লাভ, ১৯৯৭ সালে জাপানের ওয়াসেদা ইউনিভার্সিটি থেকে অনারারি ডক্টর অব ল ডিগ্রি লাভ, ১৯৯৭ সালে স্কটল্যান্ডের ডান্ডির ইউনিভার্সিটির অফ এবারটে থেকে লিবারেট আর্টসে অনারারি পিএইচডি ডিগ্রী লাভ, ১৯৯৭ সালে ভারতের নেতাজী সুভাষ চন্দ্র পদক, ১৯৯৭ সালে রোটারি ফাউন্ডেশন কর্তৃক পল হ্যারিস ফেলো ঘোষিত, ১৯৯৮ সালে পাবর্ত্য চট্টগ্রামে ২৫ বছরের গৃহযুদ্ধ অবসানের ক্ষেত্রে অসামান্য অবদানের জন্য ইউনোস্কে'র ফেলিক্স হোফে-বোইনি শান্তি পদক লাভ, ১৯৯৮ সালে সর্বভারতীয় শান্তির পরিষদের মাদার তেরেসা পদক লাভ, ১৯৯৮ সালে বাংলাদেশে তৃণমূল পর্যায়ে ধর্মীয় সম্প্রীতি ও গণতন্ত্র প্রসারে অবদানের জন্য নরওয়ের অসলোর মহাত্মা মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী ফাউন্ডেশন কর্তৃক এম কে গান্ধী পদক, ১৯৯৬-৯৭ সালে লায়ন্স ক্লাব ইন্টারন্যাশনালের মেডেল অব ডিস্টিংশন এবং ১৯৯৮-৯৯ সালে হেড অব স্টেট মেডেল, ১৯৯৯ সালে ভারতের পশ্চিমবঙ্গের বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অনারারি ডিগ্রী 'দেশিকোত্তম' (ডক্টর অব লিটারেটর), ১৯৯৯ সালে ক্ষুধার বিরুদ্ধে আন্দোলনের অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (ফাও)-এর সেরেস মেডেল, ১৯৯৯ সালে অস্ট্রোলিয়ান ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির ডক্টর অব ল, ১৯৯৯ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনারারি অব ল, ২০০০ সালে আফ্রো-এশিয়ান লইয়ার্স ফেডারেশনের পার্সন অব দ্য ইয়ার, ২০০০ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কানেস্টিকাট অঙ্গরাজ্যের ইউনিভার্সিটি অব ব্রিজপোর্ট থেকে অনারারি ডক্টর অব হিউম্যান লেটার্স, ২০০০ সালে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক মানবাধিকারের ক্ষেত্রে সাহসিকতা ও দূরদর্শিতার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভার্জিনিয়ার র‍্যানডল্ফম্যাকন ওম্যান কলেজ

থেকে পার্ল এস বাক পদক, ২০০৫ সালে ইন্টারন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন অব লায়ন্স ক্লাবের মেডেল অব মেরিট পদক, প্যাট্রিস লুবাম্বা পিপল্‌স্ ফ্রেন্ডশিপ বিশ্ববিদ্যালয়, মস্কো (২০০৫), ২০০৫ সালে ফিলিপিনের পার্লামেন্ট ‘কংগ্রেসনাল মেডেল অব এচিভমেন্ট’ এওয়ার্ড, ২০০৯ সালে ভারত সরকারের ইন্দিরা গান্ধী পদক, ২০১০ সালে শিশুমৃত্যুর হার কমানোর ক্ষেত্রে সাফল্যের জন্য জাতিসংঘের এমডিজি পদক, ২০১০ সালে সেন্ট পিটার্স বার্গ স্টেট বিশ্ববিদ্যালয়, রুশ ডেটারেশন থেকে সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ, ২০১১ সালে গণতন্ত্র সুসংহতকরণে প্রচেষ্টা ও নারীর ক্ষমতায়নে অবদান রাখার জন্য ফ্রান্সের দোফিঁ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বর্ণপদক, ২০১১ সালে বিশ্ব মহিলা ও শিশু স্বাস্থ্য উন্নয়নে অবদানের জন্য জাতিসংঘ ইকনোমিক কমিশন ফর আফ্রিকা, ২০১১ সালে বাংলা একাডেমি ফেলোশিপ ২০১১, ২০১২ সালে ভারতের ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টর অব লিটারেচার, ২০১২ সালে বাংলাদেশে সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য রক্ষা এবং সাংস্কৃতিক কার্যক্রম এগিয়ে নিতে বিশেষ অবদানের জন্য ইউনেস্কোর কালচারাল ডাইভার্সিটি পদক, ২০১৩ সালে জাতিসংঘে এন্টিগুয়া-বারমুডার স্থায়ী মিশন, আন্তর্জাতিক টেলিকমিউনিকেশন ইউনিয়ন ও সাউথ নিউজের সাউথ-সাউথ পদক, ২০১৪ সালে নারীর ক্ষমতায়ন এবং নারীশিক্ষার প্রতি তার অঙ্গীকারের জন্য ইউনেস্কো’র পিস ট্রি পুরস্কার’, ২০১৫ সালে জলবায়ু পরিবর্তনের ওপর নেতৃত্বের জন্য জাতিসংঘের চ্যাম্পিয়ন্স অব দি আর্থ পুরস্কার এবং ২০১৫ সালে ইন্টারন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন ইউনিয়ন (আইটিইউ) আইসিটি সাসটেনবল ডেভেলপমেন্ট অ্যাওয়ার্ড লাভ করেন। লাখ লাখ রোহিঙ্গাকে বাংলাদেশে আশ্রয় দেওয়ায় ২০১৭ সালে যুক্তরাজ্যভিত্তিক ‘চ্যানেল ফোর’ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে মাদার অব হিউম্যানিটি অভিধায় ভূষিত করে। পরবর্তীতে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এ নামে পদক চালুক নিমিত্তে ‘মাদার অব হিউম্যানিটি’ সমাজকল্যাণ পদক নীতিমালা ২০১৮-এর অনুমোদন দেয় মন্ত্রীসভা। যা অন্যান্য জাতীয় পুরস্কার যেমন—স্বাধীনতা পদক, একুশে পদকের সমমানের। ৭ই মার্চ ২০১৯-এ প্রধানমন্ত্রীকে ‘লাইফটাইম কন্ট্রিবিউশন ফর উইমেন এমপাওমারম্যান্ট’ এয়্যাওয়ার্ড এ ভূষিত করে ‘ইনস্টিটিউট অব সাউথ এশিয়ান উইমেন’। ১৬ই সেপ্টেম্বর ২০১৯ ড. কালাম স্মৃতি ইন্টারন্যাশনাল এক্সেলেন্স অ্যাওয়ার্ড ২০১৯ পেয়েছেন শেখ হাসিনা। ২৩ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ ‘ভ্যাকসিন হিরো’ পুরস্কার দিয়েছে গ্লোবাল অ্যালায়েন্স ফর ভ্যাকসিনেশন এবং ইমিউনাইজেশন (জিএভিআই)। আঞ্চলিক শান্তি পুরস্কার ও সমৃদ্ধি বজায় রাখার অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ঠাকুর শান্তি পুরস্কার ২০১৮ প্রদান করা হয়েছে। কলকাতা এশিয়াটিক সোসাইটি এই পুরস্কার প্রদান করে অক্টোবর, ২০১৯।

বঙ্গমাতা ফজিলাতুন নেসা

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মাতা যার কোলেপিঠে, স্নেহ-মমতায় তিনি বড় হয়ে উঠেছেন, সেই বঙ্গমাতার কথা খুব সংক্ষেপে জেনে নিতে পারি। ফজিলাতুন্নেসা রেনু ১৯৩০ সালে ৮ আগস্ট গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়ায় এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিন বছর বয়সে তিনি পিতা জহুরুল হক ও ৫ বছর বয়সে মাতা হোসনে আরা বেগমকে হারান। তখন তাঁর দাদা শেখ আবুল কাশেম বঙ্গমাতা ফজিলাতুন্নেসা রেনুর চাচাতো ভাই শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে তাঁর বিয়ে দেন। শেখ মুজিবুর রহমানের মা সায়েরা খাতুনের স্নেহ মায়া-মমতায় তিনি বড় হতে থাকেন।

বাংলাদেশের মহান স্থপতি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সহধর্মিণী, বঙ্গমাতা ফজিলাতুন্নেসা রেনু একদিকে যেমন বঙ্গবন্ধুর সংসারে হাল ধরেছেন, অন্যদিকে সেই তিনিই রাজনৈতিক অঙ্গনে ছিলেন নেপথ্যের মহীরূহ।

প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সুযোগ না হলেও, তিনি ছিলেন জ্ঞানী, বুদ্ধিদীপ্ত, বিচক্ষণ, দায়িত্ববান ও ধৈর্যশীল এক নারী। বঙ্গবন্ধুর জীবনে তাঁর প্রভাব ছিল অপরিসীম। এ যাবৎ বিভিন্ন সূত্র থেকে তা জানা গেলেও, এখন বঙ্গবন্ধুর নিজের কথা থেকে বেগম ফজিলাতুন্নেসা মুজিব সম্বন্ধে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ও অজানা তথ্য জানা যায়। বঙ্গবন্ধুর আত্মজীবনী লেখার পেছনেও মূল প্রেরণা ও উৎসাহ তাঁরই। এ সম্বন্ধে বঙ্গবন্ধু লিখেছেন:

আমার সহধর্মিণী একদিন জেলগেটে বসে বলল, "বসেই তো আছো। লেখ তোমার জীবনের কাহিনী।" বললাম, "লিখতে যে পারি না; আর এমন কি করেছি যা লেখা যায়!"....."আমার জীবনের ঘটনাগুলি জেনে জন সাধারণের কি কোন কাজে লাগবে? কিছুই তো করতে পারলাম না.....আমার স্ত্রী যার ডাক নাম রেনু আমাকে কয়েকটা খাতাও কিনে জেলগেটে জমা দিয়ে গিয়েছিল। জেল কর্তৃপক্ষ যথারীতি পরীক্ষা করে খাতা কয়টা আমাকে দিয়েছেন। রেনু আরও একদিন জেলগেটে বসে আমাকে অনুরোধ করেছিল। তাই আজ লিখতে শুরু করলাম।"

বেগম ফজিলাতুন্নেসা মুজিব শুধু বঙ্গবন্ধুর স্ত্রীই ছিলেন না, তিনি ছিলেন একই সঙ্গে দেশপ্রেমে, উদ্বুদ্ধ, রাজনীতি-সচেতন এক মহীয়সী নারী। আমাদের স্বাধীনতা অর্জনে লোকচক্ষুর অন্তরালে থেকে নিভৃতচারীর বেশে বঙ্গবন্ধুকে তিনি যুগিয়েছেন সর্বপ্রকার সাহস, শক্তি, প্রেরণা।

আমরা অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে বলতে পারি যে, স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নাম যেমন চিরকাল ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে তেমনি জাতি চিরকাল স্মরণ করবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর

রহমান এর পত্নী বঙ্গমাতা ফজিলাতুন্নেসা রেনুকে। বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার যুদ্ধে নেতৃত্ব দিয়েছেন, কিন্তু এই নেতৃত্বকে সাহস, শক্তি এবং সকল দুঃখ ও নির্যাতনের ধৈর্য ও প্রেরণা যুগিয়েছেন এই সংগ্রামী নারী। শেখ মুজিবুর রহমানকে জীবনের বেশির ভাগ সময়ই গ্রেফতার হয়ে জেলে থাকতে হয়েছে। বঙ্গবন্ধু গ্রেফতার হলে ফজিলাতুন্নেসা নিজে মামলার কাজ ও দল পরিচালনা করেন। এমনকি নিজের গহনা বিক্রি করে ছাত্র সংগঠন ও আন্দোলন পরিচালনা করতেন। তবে এই দুঃসময়ে তিনি বিচলিত না হয়ে, ন্যায় ও নীতির প্রতি অবিচল ও অটল থেকে সাহসিকতার সাথে পরিস্থিতি মোকাবেলা করেন। আর এই সময় শেখ মুজিবুর রহমানের কাছ থেকে পার্টি ও কর্মীদের প্রতি নির্দেশ জেনে তা নেতা-কর্মীদের প্রদান করে তিনি নেতা ও কর্মীদের মাঝে সেতু হিসাবে কাজ করেন।

ফজিলাতুন্নেসার মহৎ কাজ ও নেপথ্যের রাজনৈতিক কর্মজীবনের বিচক্ষণতা, দূরদর্শিতা সকলের কাছে অনুকরণীয় ও অনুসরণীয় হয়ে থাকবে। বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাসের সঙ্কটময় মুহূর্তে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালনের জন্য বাঙ্গালী জাতি চিরকাল স্মরণ করবে মহীয়সী নারী বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন্নেসা রেনুকে। আর এই মহীয়সী নারীর আদর্শে বড় হয়ে উঠেছেন তাঁর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

বেগম রোকেয়ার স্বপ্নের সার্থক প্রতিফলন

বেগম রোকেয়ার আদর্শে উজ্জীবিত শেখ ফজিলাতুন্নেসার সুযোগ্য কন্যা জননেত্রী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে আমরা অবশ্যই মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর রূপকল্প– ২০২১-এ মধ্য আয়ের দেশে পৌঁছাবো। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যেই বর্তমান সরকার সর্বাধিক অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিতকরণ ও অধিকার বাস্তবায়নের স্বার্থের নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। রূপকল্প– ২০২১ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নারীরা শিক্ষাসহ সর্বক্ষেত্রে এগিয়ে যাচ্ছে। ২০৪১ সালে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে অবশ্যই আমরা উন্নত দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হব– ইন্‌শাআল্লাহ্। আর এই উন্নত দেশে এটাই প্রমাণ হবে বাংলার নারীরা সৃষ্টিজগতের শ্রেষ্ঠ অংশের অর্ধেক এবং বেগম রোকেয়ার স্বপ্নের সার্থক প্রতিফলন। আমাদের জাতীয় কবি বিদ্রোহী কাজী নজরুল ইসলাম এর সেই বাণী আজ সত্য ও বাস্তব। 'বিশ্বের যা কিছু মহান ও চির কল্যাণকর-অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর'। বাংলার নারী সমাজ আজ অনেক দেশেই অনুকরণীয় ও ঈর্ষান্বিত অবস্থানে রয়েছে বলে আমাদের বিশ্বাস। বর্তমানে নারীর ক্ষমতায়নে বাংলাদেশ এশিয়ার দেশগুলোর শীর্ষে।

বেগম রোকেয়ার সকল উক্তির সফল বাস্তবায়ন করেছেন আমাদের গর্ব, সোনার বাংলার স্বপ্নদ্রষ্টা জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের যোগ্য কন্যা এবং সফল রাষ্ট্রনায়ক বাংলার নারীদের জজ-ব্যারিস্টার হওয়ার কাণ্ডারি শেখ হাসিনা। বর্তমান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা "বেগম রোকেয়া দিবস"-এর ভাষণে বেগম রোকেয়ার এই উক্তিগুলোকে স্বাগত জানিয়ে বলছেন, দেখ দেখ বেগম রোকেয়া, "আজতো এদেশের নারীরা কেরানি, ব্যারিস্টার, জজ, ম্যাজিস্ট্রেট, স্পীকার, বিরোধী দলীয় নেতা এবং সংসদীয় নেতা-বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী। অতএব বেগম রোকেয়া এবার জাগিয়া উঠ– দেখ, দেখ তোমার স্বপ্ন আজ সার্থক হয়েছে।"

আর আমি বলব মানবতার জননী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা হচ্ছেন আমাদের মাঝে বেগম রোকেয়ার স্বপ্নেরই প্রতিচ্ছবি। মহান আল্লাহ্‌র অসীম কৃপায় তাঁর মধ্যেই আমরা খুঁজে পেয়েছি আমাদের বেগম রোকেয়াকে।

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কন্যা হিসেবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশ ও জাতির প্রতি দায়িত্ব পালনে আজ এক অভিভাবকে পরিণত হয়েছেন। আন্তর্জাতিকভাবেও তাঁর রাজনৈতিক দূরদর্শিতা, উন্নয়ন কর্মকাণ্ড এবং শান্তি ও মানবতার সংগ্রাম বিপুলভাবে প্রশংসিত। সরকার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জনপ্রিয়তা আজ দেশে বিদেশে ছড়িয়ে পড়েছে। বাংলার নারীদের উন্নয়ন নিয়ে বেগম রোকেয়ার যে স্বপ্ন ছিল সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ এক উজ্জ্বল সম্ভাবনা নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। নারী-পুরুষের সমতাভিত্তিক সমাজ বিনির্মাণে বাংলাদেশ আজ বিশ্বে উন্নয়নের রোল মডেল। আমরা আশা করি, বেগম রোকেয়ার কর্ম ও আদর্শে উজ্জীবিত হয়ে আজকের নারীরা জাতির পিতার স্বপ্নের বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে এগিয়ে যাবেন।

তবে বেগম রোকেয়ার সবচেয়ে বড় স্বপ্ন ছিল বাঙ্গালী মুসলিম সমাজকে নৈতিক ও সামাজিক অধঃপতনের ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করা। মহানবী (সা) মুসলিম উম্মাহকে কুরআনের নির্দেশানুযায়ী চলার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু বাঙ্গালী মুসলিম সমাজ পবিত্র কুরআনের নির্দেশ থেকে সরে গিয়ে নিজেদের মতানুযায়ী মুসলিম নারী সমাজকে তাদের প্রকৃত অধিকার থেকে বঞ্চিত করে। তাই তিনি "ধ্বংসের পথে বঙ্গীয় মুসলিম" প্রবন্ধে চমৎকার করে তুলে ধরেছেন মুসলিম সমাজের অধঃপতনের কথা। তিনি অত্যন্ত গভীরভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, আমাদের নৈতিক ও সামাজিক অধঃপতনের একমাত্র কারণ হচ্ছে, আমরা পবিত্র কুরআনের নির্দেশ সঠিকভাবে পালন করছি না। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন ঘোষণা দিয়েছেন, একজন মানুষকে জন্ম থেকে শুরু করে মৃত্যু পর্যন্ত কিভাবে চলতে হবে। বেগম রোকেয়া তাঁর 'ধংসের পথে

বঙ্গীয় মুসলিম’ প্রবন্ধে বলেন, “ছেলেবেলায় আমি মার মুখে শুনতুম, “কোরান শরীফ ঢাল হয়ে আমাদের রক্ষা করবে। সে কথা অতি সত্য, অবশ্য তার মানে এ নয় যে, খুব বড় আকারের সুন্দর জেলদ বাঁধা কুরআনখানা আমার পিঠে ঢালের মতো করে বেঁধে নিতে হবে। বরং আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে আমি এই বুঝি যে, কুরআন শরীফের সার্বজনীন শিক্ষা আমাদের নানাপ্রকার কুসংস্কারের বিপদ থেকে রক্ষা করবে। কুরআন শরীফের বিধান অনুযায়ী ধর্ম-কর্ম আমাদের নৈতিক ও সামাজিক অধঃপতন থেকে রক্ষা করবে।”

বেগম রোকেয়া মুসলিম সমাজে বিদ্যমান পুরুষ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত কুসংস্কারের বেড়াজাল ছিন্ন করে ইসলাম প্রদত্ত নারীর শিক্ষা ও প্রকৃত অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য সারাজীবন সংগ্রাম করে গেছেন। আর এই সংগ্রামের মাধ্যম হিসাবে তাঁর প্রবন্ধসমূহের মধ্যে তা বারবার প্রতিভাত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে বেগম রোকেয়া ছিলেন ইসলামী আদর্শে নারী শিক্ষার অগ্রদূত, একজন ইসলামী চিন্তাবিদ এবং সর্বোপরি একজন সমাজসংস্কারক।

বেগম রোকেয়ার স্বপ্নের প্রজাপতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা স্বপ্নের ডানা মেলে অক্লান্ত পরিশ্রম করে চেষ্টা ও সাধনার মাধ্যমে তাঁর প্রায় সব স্বপ্নই বাস্তবায়িত করেছেন। কোনো কোনো ক্ষেত্রে অতিক্রমও করেছেন। যার ফসল বাংলার মুসলিম নারীরা আজ উপভোগ করছেন, উপলব্ধি করছেন এবং স্বচক্ষে দেখতে পাচ্ছেন।

সবশেষে বলব বেগম রোকেয়ার প্রায় সব স্বপ্নই বাংলাদেশের নারীরা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছেন। কিন্তু তাঁর অত্যন্ত মূল্যবান একটি উপদেশ ছিল যা আমরা এখনও পর্যন্ত অর্জন করতে পারি নাই। কারণ বেগম রোকেয়ার মুসলিম সমাজের প্রতি নির্দেশ এবং উপদেশ ছিল পবিত্র কুরআন অর্থ ও তাফসীরসহ শিক্ষা গ্রহণ করে নিজের জীবনে তা বাস্তবায়িত করা। তাই তিনি ‘বঙ্গীয় নারী শিক্ষা সমিতির সভানেত্রীর অভিভাষণে’ বলেন, “মুসলমান বালিকাদের প্রাথমিক শিক্ষার সঙ্গে কুরআন শিক্ষাদান করা সর্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজন। কুরআন শিক্ষা অর্থে শুধু টিয়া পাখীর মতো আরবী শব্দ আবৃত্তি করা আমার উদ্দেশ্য নহে। বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষায় কুরআনের অনুবাদ শিক্ষা দিতে হইবে। সম্ভবত এ জন্য গভর্নমেন্ট বাধ্যতামূলক আইন পাশ না করিলে আমাদের সমাজ মেয়েদের কুরআন শিক্ষাও দিবে না। যদি কেহ ডাক্তার ডাকিয়া ব্যবস্থাপত্র (Prescription) লয়, কিন্তু তাহাতে লিখিত ঔষধপত্র ব্যবহার না করিয়া সে ব্যবস্থাপত্রখানাকে মাদুলীরূপে গলায় পরিয়া থাকে, আর দৈনিক তিনবার করিয়া পাঠ করে, তাহাতে কি সে উপকার পাইবে? আমরা পবিত্র কোরান শরীফের লিখিত অনুযায়ী কোন কার্য করি না, শুধু তাহা পাখীর মতো পাঠ করি আর কাপড়ের থলিতে (জুযদানে)

পুরিয়া অতি যতেন উচ্চ স্থানে রাখি। ...আমার অমুসলমান ভগিনীগণ! আপনারা কেহ মনে করিবেন না যে, প্রাথমিক শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে কুরআন শিক্ষা দিতে বলিয়া আমি গোঁড়ামীর পরিচয় দিলাম। তাহা নহে, আমি গোঁড়ামী হইতে বহুদূরে। প্রকৃত কথা এই যে, প্রাথমিক শিক্ষা বলিতে যাহা কিছু শিক্ষা দেওয়া হয়, সে সমস্ত ব্যবস্থাই কুরআনে পাওয়া যায়। আমাদের ধর্ম ও সমাজ অক্ষুন্ন রাখিবার জন্য কুরআন শিক্ষা একান্ত প্রয়োজন।" এ থেকে বুঝা যায় যে তিনি শুধু কোরান তিলাওয়াত সমর্থন করতেন না, বরং তার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করা জরুরি মনে করতেন, যাতে লোকেরা কুরআনকে ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং রাষ্ট্রীয় জীবনে তথা জীবনের সকল পর্যায়ে প্রয়োগ করতে পারে। এখানে একটি কথা বলা অবশ্যই প্রয়োজন যে, বেগম রোকেয়া তৎকালীন সামাজিক প্রেক্ষাপটে শুধুমাত্র বালিকাদেরকে বাধ্যতামূলকভাবে পবিত্র কুরআন শিক্ষার কথা বলেছেন। কিন্তু এখন বেগম রোকেয়া আমাদের মাঝে থাকলে বলতেন ছেলে-মেয়ে উভয়কে বাধ্যতামূলক পবিত্র কুরআন শিক্ষা দান করা সর্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজন।

মানবতার জননী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে আকুল আবেদন বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্ম যাতে তাঁদের জীবনকে পবিত্র কুরআনের নির্দেশ মোতাবেক পরিচলিত করে আমাদের দেশ ও জাতিকে বিশ্বের দরবারে সর্বোচ্চ নৈতিক ও উন্নত জাতি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। তাই নারী জাগরণের অগ্রদূত বেগম রোকেয়ার কণ্ঠের সাথে সুর মিলায়ে বলতে চাই, আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় পবিত্র কুরআন অর্থসহ বুঝে পড়ার জন্য বাধ্যতামূলক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা। যাতে আমাদের সন্তানেরা পবিত্র কুরআনের বিধানগুলো উপলব্ধি করতে পারে এবং প্রকৃত মুসলিমরূপে গড়ে উঠতে পারে। সাথে সাথে অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদেরকেও স্ব স্ব ধর্মীয় শিক্ষা বাধ্যতামূলকভাবে শিক্ষার ব্যবস্থা করা। যাতে প্রত্যেক ধর্মের শিক্ষার্থী নৈতিকতা ও মনুষ্যতত্ত্ববোধসম্পন্ন প্রকৃত মানুষরূপে গড়ে উঠতে পারে। কেননা প্রত্যেক ধর্মের মূল বক্তব্যই হচ্ছে নৈতিক শিক্ষা দেয়া। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তাঁর সঠিক দিক নির্দেশনার মাধ্যমে আমাদের বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য পবিত্র কুরআন অর্থ ও তাফসীরসহ পড়ানোর জন্য সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি বাধ্যতামূলক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে বেগম রোকেয়ার সবচেয়ে বড় স্বপ্নটিও বাস্তবায়িত করতে সক্ষম হবেন– ইন্‌শাআল্লাহ্।♦

তথ্য উৎস ও গ্রন্থপঞ্জি

১। রোকেয়া-রচনাবলী, সম্পাদক আব্দুল কাদির, বাংলা একাডেমি, ডিসেম্বর, ১৯৭৩।
২। বেগম রোকেয়া দিবস– ২০১৩।
৩। বেগম রোকেয়া দিবস– ২০১৫।
৪। বেগম রোকেয়া দিবস– ২০১৬।
৫। বেগম রোকেয়া দিবস– ২০১৮।
৬। বেগম রোকেয়া দিবস– ২০১৯।
৭। ড. হারুন-অর-রশীদ, বঙ্গবন্ধুর দ্বিতীয় বিপ্লব কি এবং কেন, বাংলা একাডেমী, ফেব্রুয়ারি, ২০২০।
৮। ড. হারুন-অর-রশীদ, ৭ই মার্চের ভাষণ কেন বিশ্ব ঐতিহ্য সম্পদ, বঙ্গবন্ধু মুক্তিযুদ্ধ বাংলাদেশ, বাংলা একাডেমী, ফেব্রুয়ারি, ২০১৮।
৯। দৈনিক আমাদের অর্থনীতি, ঢাকা ১৩ই সেপ্টেম্বর, ২০১৭, পৃ. ১-২।
১০। দৈনিক জনকণ্ঠ, ঢাকা, ১৩ই সেপ্টেম্বর, ২০১৭, পৃ. ১।
১১। ড. মাহবুবা রহমান, কুরআন ও হাদীসের আলোকে নারী। ইসলামিক ফাউন্ডেশন, জুলাই, ২০০৫।
১২। অধ্যাপক মমতাজ বেগম, স্বাধীনতা যুদ্ধে বাংলার নারী, হাক্কানী পাবলিশার্স, ফেব্রুয়ারি, ২০১৮।
১৩। শেখ মুজিবুর রহমান, অসমাপ্ত আত্মজীবনী, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, জানুয়ারি, ২০১৯।
১৪। মমতাজ বেগম, মহীয়সী নারী বঙ্গমাতা ফজিলাতুন নেসা, জাতীয় মহিলা সংস্থা মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয়, ৩০ জুন, ২০১৩।
১৫। ইসলামিক ফাউন্ডেশন ডায়েরি– ২০২০।
১৬। ড. মো. আশিকুর রহমান, ইসলামী আদর্শ ও মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, চিত্রা প্রকাশনী, ১ম প্রকাশ, অমর একুশে গ্রন্থমেলা, ২০১৬।
১৭। মোতাহার হোসেন সুফী, বেগম রোকেয়া জীবন ও সাহিত্য, সুবর্ণ, ২০০১।
১৮। তাহমিনা আলম, বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন, চিন্তা-চেতনার ধারা ও সমাজকর্ম, বাংলা একাডেমি, পৃ. ২১৬-২১৭; নবনূর, ভাদ্র, ১৩১৯, পৃ. ৪১-৪২।

লেখক : সাবেক সহযোগী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, লালমাটিয়া মহিলা কলেজ, ঢাকা।

বঙ্গবন্ধুর ফেরা

সোহরাব পাশা

অঙ্গার ও কাঠকয়লার নিচে পুড়ছিলো নতুন ভোরের
স্বপ্নদিন, ভালো থাকার আনন্দ সময়,
দুপুরে নেমে আসে মেঘলা সন্ধ্যা, জ্বলছিলো সেদিন গোপন
সর্বনাশ, চারদিকে বিষাদের নিভৃত আগুন;
সেই ভয়ংকর দুঃসময়ে দৃপ্ত পায়ে তুমি এলে
দুঃসাহসে অন্ধ অবরুদ্ধ আলোর দুয়ার খুলে
ঘুরে দাঁড়ালো মানুষ তোমার আহ্বানে,

অপূর্ব ধ্রুপদী ভাষা ছিলো তোমার বিনম্র কণ্ঠে
জীবনের নিবিড় ভালোবাসা ছিলো বাংলাদেশ
আর বাংলার বঞ্চিত দুঃখি মানুষের প্রতি
তাই তুমি মৃত্যুভয়কে উপেক্ষা করেছো বার বার

একদিন অবিশ্বাস্য ঘাতক আঁধার কেড়ে নিলো বাংলার
প্রাণ, তোমার বিষাদে মুখ ঢাকলো ভোরের সূর্য
বিপুল বিস্ময়ে অবাক নির্বাক হলো সারা বিশ্ব
আজও কাটেনি সেই ঘোর এতো অশ্রু, এতো রক্ত
কীভাবে ধারণ করে আছে বাংলার মাটি আর জল!

‘বঙ্গবন্ধু’, তোমার নামেই বাংলাদেশ, এই উজ্জ্বল পতাকা।

প্রিয় নাম বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

দেলওয়ার বিন রশিদ

প্রত্যহ চিন্তা চেতনায়
বয়ে আনে স্বপ্ন আশা
নতুন জাগরণ যে নাম
সে নাম বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।
"এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম"
এখানে মুহূর্তে মুহূর্তে প্রতিধ্বনিত হয়
আপনার সেই কণ্ঠস্বর
ভোরের কোমল রোদ গায়ে মেখে
সবুজ আল ধরে
বিরুই কালিজিরা ধানের সুগন্ধে বিভোর হয়ে
যখন সন্মুখে হেঁটে যাই
কানে বাজে আপনার সেই কণ্ঠস্বর
"এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম
এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম"
সূতি, বর্ণী, নরসুন্দা, ফুলেরশ্বরীর পাড় ধরে
শিম কুমড়োর বন পেরিয়ে আরো দূরে
মেঠোপথ ধরে সন্মুখে এগিয়ে
নিম জারুলের সবুজ ছায়া মাড়িয়ে
যেতে যেতে শুনতে পাই এখনও
আপনার সেই কণ্ঠস্বর,
এ দেশের মাটি-মানুষকে
আপনি গভীরভাবে ভালোবেসেছিলেন।
প্রতি গ্রাম গঞ্জ শহরে এখনও
আপনার দৃঢ় প্রত্যয়ী কণ্ঠস্বর প্রতিধ্বনিত হয়।
সবুজ শ্যামলিমা বাংলার পথে প্রান্তরে ক্ষেত খামারে
বসত বাড়ির আঙিনায়, দুঃখী মানুষের হৃদয়ে আপনি,
প্রতিটি হৃদয়ে হৃদয়ে আপনি রয়েছেন।
আমাদের চিন্তা চেতনায় আপনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।
আমাদেরকে জাগ্রত করে আপনার কণ্ঠস্বর অবিরাম।
কর্মে-কাজে মুহূর্তে মুহূর্তে দীপ্ত করে আপনার প্রিয় মুখ, প্রিয় নাম
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

বঙ্গবন্ধুর অমর কীর্তি
মালেক মাহমুদ

তোমার ঐতিহাসিক কণ্ঠস্বর– মুক্তির সংগ্রাম
স্বাধীন সার্বভৌম মাতৃভূমি, প্রিয় বাংলাদেশ
সতত স্মরণে বরণে তোমাকে করেছে মহান।

এই দিগন্ত বিস্তৃত সবুজের মেঠোপথ প্রান্তর
পদ্মা মেঘনা যমুনা মধুমতি তুরাগ তিতাস
হাজার নদীর অববাহিকায়, সমুদ্র সৈকতে উড়ন্ত
শঙ্খচিল, শুভ্রবক আর বুনো শালিকের ঝাঁক
আজো সুমধুর সুরে গাইছে তোমার জয়গান।

তোমার সমুজ্জ্বল উপস্থিতি থেকে উদ্ভাসিত হয়
অমারাত্রির আঁধার বিনাশী প্রথম আলোর স্ফুলিঙ্গ
প্রভাতের সোনারোদে নিত্যরত দোয়েলের আনন্দ।

তোমার অক্ষয় কীর্তিতে সুমধুর স্মৃতিতে মুগ্ধ হয়ে
স্বপ্নীল পাহাড়ের পাদদেশে বাংলাদেশের হৃদয় থেকে
নিঃসৃত ঝর্ণাধারা অনাবিল আনন্দে ঝরে পড়ে।

জন্মশতবর্ষে আজ রূপসী বাংলার হাজার নদীর
উত্তাল তরঙ্গ, পাহাড়, পর্বত, পায়ে চলা মেঠোপথ
সুনীল আকাশ, বাউল বাতাস বিনম্র শ্রদ্ধায়-স্মরণে
তোমাকে জানায় হাজারও কবিতাঞ্জলি ও অভিনন্দন।

একাত্তরে মুক্তিযোদ্ধা

বাবুল তালুকদার

যুদ্ধ হলো একাত্তরে স্বাধীন হলো দেশ
মুক্তিকামী মানুষগুলো ভালো আছে বেশ।
শোকের ছায়া বুকে নিয়ে আছে কতলোক
ফুলের তোড়া হাতে দেখ অন্তরে যে শোক।
কত মায়ের সন্তান শহীদ হলো দেশে
নয়মাস যুদ্ধ করে স্বাধীন আনে শেষে।
গর্ব করি মা-মাটির সোনার বাংলাদেশ
মুক্তিযোদ্ধা রক্ত দিয়ে বিজয় আনে বেশ।
বঙ্গবন্ধুর হুকুম শুনে যুদ্ধ করে যাঁরা
দেশ ও মাটির রক্ষা করে মুক্তিযোদ্ধা তাঁরা।
বিজয় পেল, ভাষা পেল, পেল স্বাধীনতা
বাংলাদেশে সুখ-শান্তি নেই পরাধীনতা।

বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ

মিলন সব্যসাচী

তুমি জন্মেছিলে তাই
গোলাপের ঠোঁটে দেখেছি রক্তিম হাসি
বটের ছায়ায় বেজেছিলো রাখালের বাঁশি
অনাবিল আনন্দে প্রকৃতির শুদ্ধতম পাঠে
সুনীল আকাশ নেমেছিলো সবুজের মাঠে।
তুমি জন্মেছিলে তাই
মন-ময়ূরী পেখম খুলে নেচেছিলো স্বাধীনতার গানে
বাউরি বাতাশ দোলা দিয়েছিলো হেমন্তের পাকাধানে
তোমার শুভজন্মের আনন্দে পুষ্পিত সৌরভ ঘিরে
পদ্মা মেঘনা মধুমতি নবপ্রাণ পেয়েছিলো ফিরে।
তুমি জন্মেছিলে তাই
মুক্তিকামী মানুষ অস্ত্র তুলে নিয়েছিলো হাতে
স্বর্গীয় সুখের ঝর্ণা ঝরেছিলো মায়ের অশ্রুপাতে
ঘরে ঘরে প্রতিবাদের ঝড় উঠেছিলো বজ্রডাকে
মনোমুগ্ধ সুরে দোয়েল গেয়েছিলো মধুমতির বাঁকে।
তুমি জন্মেছিলে তাই
জাতিসত্তার পরিচয়ে আমরা আজ গর্বিত বিশ্বে
তোমার সুমহান মহৎ কীর্তি বিশ্বকীর্তির শীর্ষে
গৌরবে লাল-সবুজের পতাকা ঊর্ধ্বে তুলে ধরি
জন্মশত বর্ষে তাই সশ্রদ্ধ শ্রদ্ধায় শিরনত করি।
তুমি জন্মেছিলে তাই
আজও স্বর্গীয় সুধা ঝরে পড়ে মায়ের হাসি মুখে
তোমার জন্মের শুভক্ষণে মাতৃভূমি হেসেছিলো সুখে
রক্তাক্ত এই জনপদে কখনও আর হবে না তোমার ফেরা
অথচ তোমারই সাত মার্চের ভাষণ এখন বিশ্বের সেরা।
তুমি জন্মেছিলে তাই
আমরা বীর বাঙালি আজ সম্মানের শীর্ষচূড়ায় বাঁচি
কেউ বুদ্ধিজীবী কেউ সাংবাদিক কেউ কবি মিলন সব্যসাচী
তুমি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু বিশ্বের বিস্ময় মস্ত বীর
পিতা, পরম শ্রদ্ধায় তোমার চরণে নত করি শির।

সিন্ধুর প্রতিটি বিন্দুতে আমি খুঁজি

গাজী সাইফুল ইসলাম

চলার পথের গোপন ইশারাগুলো
তোমরা কি পারো না প্রত্যক্ষ করতে?
লাউ-শিম-লেবু গাছ লাগানোর পর
যখন তোমরা পরিচর্যা করো আগাছা নিড়াও
পানি-সার দাও—ভাব সবইতো 'আমি'ই করেছি
কিন্তু গাছদের সবুজ পাতায় যে মায়া তা তুমি কোথা থেকে পাও?
সবার অলক্ষ্যে যে বৃদ্ধি, বিস্তার
তোমরা তা প্রত্যক্ষ করো না
যখন ফুলেরা ফুটে, মধুমক্ষিকার গুঞ্জরণে আমোদিত হয় চারপাশ
গোপনে তারা নতুন জীবনের যে বীজ বপন করে যায়
তোমরা তা প্রত্যক্ষ করো না।
সাগর-নদীতে নৌকার হালটি ধরে বসে থাক
উত্তাল ঢেউয়ে আন্দোলিত হৃৎপিণ্ড তোমার
ওই উত্তাল তরঙ্গে তোমার হাল, পাল, নৌকা কত তুচ্ছ
এরপরও গন্তব্যে পৌঁছে যাচ্ছ,
জানো না কতটা গোপনে তিনি ঠিক পৌঁছে দিচ্ছেন তোমায়
তার বিশালত্ব আর মহত্বে তোমার বিশ্বাস থাকুক বা না থাকুক।
আমি যখনই কবিতা লিখতে বসি
তাঁকে অনুভবে পাই, কলমের নিবে
বিশ্বাস রাখতে পারো, তার অনুগ্রহ ছাড়া আমি কিংবা আমার কলমের
নিবের কোনোই সাধ্য নেই এমন কঠিন বার্তা পাঠায়।
যখন আমার সন্তান তার মায়ের গর্ভে
আকাশের চাঁদ হয়ে ফুটে কিংবা সাগরের শেষ বিন্দুতে
রূপকথার নায়ক হয় আমার অনাগত বংশধর
তাকে কে দেখায় পথ-এমন গোপন সরু পথ কে করে প্রশস্ত?
ধর্ষক-খুনিও ফাঁসির দড়িতে ঝোলার প্রাক্কালে
তারই করুণা ভিক্ষা করে।
তাইতো তাঁকে অস্বীকার করি না, নতজানু হতে দ্বিধা করি না...
তাঁকে খুজি একা নিবির নিশিথে, কখনো সিন্ধুর প্রতিটি বিন্দুতে
কখনো নিজের ভেতরে, অতল অন্ধকারে...।

সৃষ্টি সুখের গান

জুবাইর জসীম

একাত্তরে রক্ত দিলাম
আর দেব না রক্ত
মাথার ঘামে গড়ব স্বদেশ
আমরা মুজিব ভক্ত।

মোরগডাকা ভোরে ওঠে
কোদাল হাতে কৃষক ছোটে
বাঁচার লড়াই শুরু করার
এবার হলো অক্ত।

কামার-কুমোর, বুদ্ধিজীবী
এক হয়ে সব প্রাণ
বিভেদ ভুলে গাও সকলে
সৃষ্টি সুখের গান।

বাংলা মায়ের শূন্য ঘরে
ফল ফসলে দাও না ভরে
বিজয় সুখে মাতৃভূমির
ভিত যেন হয় শক্ত।

একাত্তরে রক্ত দিলাম
এবার দেব ঘাম
আমরা সবাই মুজিব সেনা
রাখব তাঁরই নাম।

অমর বঙ্গবন্ধু

আসিফ খন্দকার

স্রষ্টা প্রেরিত একজন দূত–
এসেছিলেন বাংলার মাটিতে,
ভূখণ্ড স্বাধীন করার মহান স্বপ্ন দেখিয়ে–
মিশে আছেন জাতির অস্তিত্বে।
তাঁর ডাকে সাড়া দিয়ে বাংলার মানুষ–
করেছিল মুক্তিযুদ্ধ,
হানাদারের ভয়ে নিরস্ত্র মানুষ–
থাকেনি ঘরে আবদ্ধ।
সাংঘাতিক যুদ্ধ দেশের মাটিতে–
চলেছিল দীর্ঘদিন,
ত্রিশ লক্ষ শহীদের প্রাণের বিনিময়ে–
দেশ হয়েছিল স্বাধীন।
স্বাধীনতার পর বিধ্বস্ত দেশের–
করেছিলেন তিনি উন্নয়ন,
শেষ করতে পারেননি কারণ–
অভ্যন্তরীণ শত্রুর আক্রমণ।
সেই দায়িত্ব এখন তাঁর সুযোগ্য–
কন্যার হাতে ন্যাস্ত,
দেশের উন্নয়ন করে চলেছেন অবিরাম–
দুর্নীতিবাজরা পালাতে ব্যস্ত।
শেখ মুজিব এই জাতির পিতা–
অপরিসীম তাঁর মহত্ত্ব,
বলে শেষ করা যাবে না তাঁর মহৎকর্ম–
যা তাঁকে এনে দিয়েছে অমরত্ব।
তাঁর সম্মানে ২০২০–
ঘোষিত হয়েছে মুজিববর্ষ,
অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে–
বঙ্গবন্ধুকে সালাম সহস্র।

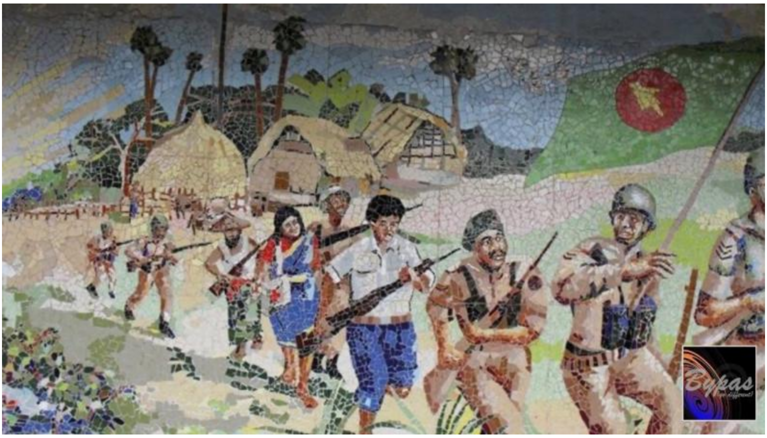

ফরিয়াদ

মো. আবদুন নূর

'মানব শিশু পাপী হয়ে জন্মগ্রহণ করে না। পরিস্থিতি আর পরিবেশের কারণে মানুষ পাপে জড়িয়ে পড়ে পাপী হয়।' পাশের একজন বললো– 'প্রত্যেক মানব শিশু ফিৎরাতের উপর জন্মগ্রহণ করে। মা-বাবা তাকে ইহুদী খ্রিষ্টান বানায়।' বাড়ির পুরুষেরা বেরিয়ে গেছে যার যার কাজে, বিদ্যালয় গমনোপযোগি ছেলে মেয়েরা গিয়েছে শিক্ষালয়ে। মহিলারা অন্দর বাড়ির দেহলীতে বসে দুপুরের রান্নার মাছ তরিতরকারি কাটাকাটি করছে আর নিজেদের মধ্যে পাপ পুণ্য ও পাপীদের নিয়ে আলোচনা করছে। মহিলাদের একজন বলে উঠলো– 'ইচ্ছাকৃতভাবেই পাপে জড়িয়ে পড়াই হচ্ছে পাপীদের স্বভাব আর পাপ কাজ চালিয়ে যাওয়াতেই তাদের আনন্দ। আমাদের উচিৎ পাপীদের ঘৃণা করা।' আলোচনা বেশ জমে উঠেছে। এরই মাঝে এক বয়স্ক ভিখারিনী এসে বললো, মাগো! আমাকে ভিক্ষা দিন। আমি অনাহারি। দয়া করে আমাকে কিছু খেতে দিন! মহিলাদের মধ্য হতে একজন উঠে গিয়ে থালায় ভাত-পেঁয়াজ, লবণ ও কিছু তরকারি দিয়ে ভিখারিনীর সামনে রেখে বললো– 'দুপুরের রান্না এখনও চুলায় চড়াইনি। সকালের ভাত তরকারি যা অবশিষ্ট ছিল তাই দিলাম। খেয়ে নিন'। পরম তৃপ্তিসহ ভিখারিনী খাবার খেতে লাগলো। কথা বার্তায় বুঝা যায় সে শিক্ষিত; আভিজাত্যের ছাপ রয়েছে তার মধ্যে।

আলোচনা চলাকালীন এক বয়োবৃদ্ধা মহিলা বলে উঠলো– আমাদের প্রত্যেকের উচিৎ পাপ হতে বেঁচে থাকার আপ্রাণ চেষ্টা করা। কেউ নফসের তাড়নায়, অনিচ্ছাকৃতভাবে ঘটনাচক্রে পাপে জড়িয়ে পড়েছে। এখন সে অনুতপ্ত। কৃত অপরাধের জন্য কান্নাকাটি করছে। অনুতপ্ত সেই পাপীকে যদি কেউ ঘৃণা করে; উল্টো সেই ঘৃণাকারীই অপরাধী হবে, পাপ হবে। আমরা পাপকে ঘৃণা করবো কিন্তু পাপীকে নয়।'

খেতে খেতে ভিখারিনী এসব কথা শুনছিলো। নিজের অজান্তেই তার চোখ বেয়ে পানি গড়িয়ে পড়ছে। খাবার শেষে সে বললো– মানুষ যে নিজের ইচ্ছার বিরূদ্ধে ঘটনাচক্রে পাপে জড়িয়ে পড়ে এর জলন্ত প্রমাণ আমি নিজেই।' 'তা কিভাবে' সমস্বরে সবাই বলে উঠলো। আমাদেরকে সেই কাহিনী বলো।

ভিখারিনী বলতে শুরু করলো– 'ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নবীনগর উপজেলার পূর্বাঞ্চলের এক গ্রামে বর্ধিষ্ণু পরিবারে আমার জন্ম। মা বাবার প্রথম সন্তান বলে অতি আদরে প্রতিপালিত হয়েছি। আর্থিক স্বচ্ছলতা ও জ্ঞান গরিমার কারণে গ্রামের লোকজন; এমনকি পার্শ্ববর্তী গ্রামের মানুষও আমার পিতাকে খুব সম্মান ও সমীহ করতো। আমাদের বাড়ির উঠোনে বা বৈঠকখানায় প্রায় প্রতিরাতেই গ্রামের লোকজন হারিকেন জ্বালিয়ে কোন না কোন বিষয় নিয়ে বৈঠক করতো। আমার আব্বা হতেন সেই সভার মধ্যমণি। উনার জ্ঞান প্রসূত সিদ্ধান্ত সবাই বিনাদ্বিধায় মেনে নিতেন।

ফুলের প্রতি পিতার ছিল খুব অনুরাগ। বিশাল বাড়ির চারি পাশে বিভিন্ন ফল-ফুলের গাছ লাগিয়েছিলেন। যেদিন শরতে শিউলী গাছে ফুল ফোটে বাড়ি গন্ধে মাতোয়ার করে তুলেছিল, কাকতালীয়ভাবে সেদিন আমার জন্ম হয়েছিল বলে পিতা আদর করে আমার নাম রাখলেন 'শিউলী'। ছোট বেলায় খেলার সাথীরা আমার গায়ের রং দেখে শরীর ঘঁষে বলতো, 'তুই এতো ফর্সা! তোর গায়ের রং আমাদের কিছু ভাগ বাটোরা করে দে।' এ নিয়ে অনেক হাসি ঠাট্টা হতো। একাত্তরে আমি অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রী। বয়স পনের হলেও অতি আদরে প্রতিপালিত হয়েছি বলে দেখতে ষোল সতের বছরের মেয়ে মনে হতো।

একাত্তরের মে-জুনে পাকবাহিনী সারা বাংলাদেশ দখল করে শক্ত অবস্থান নিয়েছে। মুক্তিযোদ্ধারাও বিভিন্ন স্থানে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে। শ্রাবণ মাসের শেষ সপ্তাহ সকাল আটটা কি সাড়ে আটটা। রাজাকারদের সহায়তায় লঞ্চ ও দেশীয় নৌকা যোগে পাক-হানাদাররা আমাদের গ্রামে এসে অগ্নি সংযোগ ও লুঠতরাজ শুরু করে। মুক্তিযোদ্ধাদের ক্যাম্পে এ সংবাদ পৌঁছলে কালবিলম্ব না করে পাগলপারা মুক্তিযোদ্ধারা অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে সম্মুখ যুদ্ধের ব্যূহ রচনা করে। এ যুদ্ধ ছিল অসম। এক পক্ষ দখলদার এবং আধুনিক অস্ত্র-সস্ত্রে ও প্রশিক্ষণে বলীয়ান; অপর পক্ষের প্রশিক্ষণে ও অস্ত্র শস্ত্রে কমতি থাকলেও দেশপ্রেমে নিবেদিত প্রাণ।

হানাদারদের কল্পনাকেও হার মানিয়ে দেশ মাতৃকার দামাল ছেলেরা প্রচণ্ড প্রতিরোধ গড়ে তোলে। পাক বাহিনী অনেক ক্ষয় ক্ষতি স্বীকার করে পিছু হটতে বাধ্য হয়। পশ্চাৎপদের সময় জ্বালিয়ে দিয়ে যায় অসংখ্য বাড়িঘর। পাক বাহিনীর গুলিতে শহীদুল নামে এক বীর মুক্তিযোদ্ধা শাহাদৎ বরণ করে। স্থানীয় হাই স্কুল প্রাঙ্গণে সম্মানের সহিত তাঁকে সমাহিত করা হয়।

আহত হায়েনারা আঘাত ভুলে যায় না। সুযোগ খুঁজে ফের আক্রমণের। ভাদ্র মাস প্রচণ্ড গরমে অস্থির গ্রামবাসী। রাতের প্রথম প্রহরে প্রচুর বৃষ্টি হয়েছে। আরামদায়ক ঠাণ্ডা বাতাসে মানুষের সুখনিদ্রা হয়েছে। শেষ রাতে প্রচণ্ড গোলাগুলির শব্দ আর আগুনের লেলিহান শিখা দেখে গ্রামবাসীর আরামের ঘুম হারাম হলো। ঘুম ঘুম চোখে কোনদিক যে নিরাপদ লোকজন ঠাহর করতে না পেরে, যে যেদিক পারে পালাতে গিয়ে পাক সেনাদের হাতে অনেকে বেঘোরে প্রাণ হারালো। খুবই ভয় পেয়ে আমিও ঘর হতে বের হয়ে কোনদিক দৌড় দিয়েছিলাম, সে খেয়াল আমার ছিল না। কিছুক্ষণের মধ্যেই টের পেলাম আমি বাঘের খাচায় পা বাড়িয়েছি। হায়েনারা আমাকে জাপটে ধরে আটক করলো। মুখে কাপড় বেঁধে পিছু মোড়ায় হাত বেঁধে তাদের অফিসারের নিকট নিয়ে গেল। কাঙ্ক্ষিত বস্তু পাওয়ার তৃপ্তির বক্র হাসি অফিসারের চোখে মুখে দেখলাম।

আমাকে লঞ্চে তুলে পাহারায় রাখলো। অনেক বাড়িঘর পুড়িয়ে লুঠতরাজ করে নিরীহ নিরস্ত্র মানুষদের হত্যা করে ওদের প্রতিহিংসা চরিতার্থ করলো। মুক্তিযোদ্ধাদের ক্যাম্পে সংবাদ পৌঁছানোর পূর্বেই পাক সেনারা আমাকে নিয়ে ওদের ঘাঁটিতে ফিরে চললো। ঘাঁটির দায়িত্বে থাকা ক্যাপটেন আমাকে দখল করে সম্ভ্রম লুটে নিল।

রূপ ও সৌন্দর্য আমার জীবনে কাল হয়ে দেখা দিয়েছিল। অত্যাচারিত হয়েছি বহুভাবে। ক্ষুধার্ত হায়েনারা দলবেধে শিকার ভোগ করে। মানুষরূপী হায়নারা একের পর এক ভোগ করে তৃপ্তির হাসি হেসেছে। হাত বদল হতে হতে শেষে কুমিল্লা ক্যান্টেনম্যান্টের বাংকারে আমার ঠাঁই হলো। আত্মহত্যা করতে চেয়েও পারিনি। আমার মতো অনেক মেয়েকে বাংকারে দেখেছি। এ দুঃসহ জীবন হতে রেহাই পেতে এদের কেউ কেউ শাড়ী গলায় পেঁচিয়ে আত্মহত্যা করেছে। হানাদার পশুরা লুণ্ঠিত বাঙালি মেয়েদের শাড়ি পরা বন্ধ করে দিয়েছিল। প্রেসিডেন্ট আইয়ুবখানের চালু করা পূর্ব পাকিস্তানের স্কুলের পাঠ্য সূচীতে ৬ষ্ঠ শ্রেণি হতে ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত উর্দু বাধ্যতামূলক করেছিল বিধায় আমি পাকজান্তাদের অনেক কথাই বুঝতে পারতাম। নভেম্বর মাসের মাঝামাঝি পাক-বাহিনীর চোখে মুখে ভয় ও আতঙ্কের ছাপ দেখেছি। ১৬ ডিসেম্বর পাক সেনারা আত্মসমর্পণ

করলে ভারতীয় মিত্র বাহিনী পাক সেনাদের বাংকারে মেয়েদের লাশ, কংকাল এবং কোন কোন বাংকারে আমার মতো ধর্ষিতা মেয়েদের দেখে অবাক হয়েছে।

কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্টের বাংকার হতে উদ্ধার করে আমাকে নিজ থানায় পাঠিয়ে দেয়। আমার দেয়া তথ্যানুসারে পিতাকে সংবাদ প্রেরণ করা হলো মাকে সঙ্গে নিয়ে পিতা থানা প্রশাসনের সাথে সাক্ষাৎ করেন। থানা প্রশাসন মা বাবাকে কিছু প্রশ্ন করে নিশ্চিত হবার পর আমাকে তাঁদের সামনে নিয়ে এলো। আমাকে দেখার সাথে সাথে পিতা নিজেকে সংবরণ করে রাখলেও মা আত্মহারা হয়ে স্থান-কাল-পাত্র ভুলে গেলেন। এতদিন পাক-জান্তাদের ক্যাম্প হতে উদ্ধার পাওয়া মেয়েকে সমাজ কোন চোখে দেখবে এর তোয়াক্কা না করে থানার আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করে মা বাবা আমাকে নিয়ে বাড়ির দিকে রওনা হলো।

পথে মাকে বাবা প্রশ্ন করলেন– মেয়ে পেয়েছি এতো অনেক আনন্দের কিন্তু গ্রামের লোকজন তো জেনেছে পাক বাহিনীর সৈন্যরা আমাদের মেয়েকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল। এতদিন পর পাক সেনাদের ক্যাম্প হতে উদ্ধার পাওয়া মেয়েকে বাড়ি নিয়ে যাচ্ছি। গ্রাম্য সমাজ আমাদের কি বলবে? 'মা বললেন মেয়ে ফিরে পেয়েছি এতো বড় কথা। সমাজ, গ্রামের লোকজন কি বলবে তা ভেবে আমাদের কি হবে? 'হবে? হবে। শিউলীর মা! সমাজে বাস করতে হলে সমাজের কথাও ভাবতে হবে। রক্ষণশীল সমাজের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করা কঠিন।

আমাকে নিয়ে বাড়ি পৌঁছতে রাত হয়ে গেল। সংবাদ চাপা রাখার চেষ্টা করেও সম্ভব হয়নি। দু' দিনের মধ্যেই আমার উদ্ধারের সংবাদ গ্রামময় ছড়িয়ে পড়লো। কত বাহানা করে মা আমাকে লুকিয়ে রাখতেন। চিড়িয়াখানায় নতুন প্রাণি এলে কৌতুহলী মানুষ যেমন ভিড় করে, আমাকে দেখার জন্য তেমনি ভিড় জমাতে থাকে।

কিছুদিন পর হঠাৎ একদিন আমার বমি হতে লাগলো। মাছ গোস্তের গন্ধ সহ্য করতে পারছি না। এদেখে মা কাঁদতে লাগলেন। 'হাতি যখন ফাঁদে পড়ে চামচিকিও তাকে লাথি মারে।' এতদিন পিতা যাদের অন্যায়ের বিচার করেছে তারা দল বেঁধে এসে পিতাকে বললো– "আপনি আমাদের গ্রামের গণ্য-মান্য ব্যক্তি। শুনলাম আপনার মেয়ের গর্ভে পাক হানাদারদের ঔরসজাত সন্তান আসতেছে। আপনি তাহলে পাক মেলিটারির জারজ সন্তানের নানা হচ্ছেন। আমরা কিভাবে তা মেনে নিবো?" তাদের কথায় পিতা ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলো আর তাঁর দু' চোখের পানি গাল বেয়ে পড়তে লাগলো। এই অপমান হতে পিতা-মাতাকে রক্ষা করার জন্য সেই রাতেই ঘর ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে মাকে উদ্দেশ্য করে চিঠি লিখলাম–

'মা! আমি তোমার নাড়ি ছেড়া প্রথম সন্তান। তোমাদের হৃদয় নিংড়ানো ভালোবাসায় আমি বড় হয়েছি; কিন্তু আজ আমারই জন্য তোমরা সমাজের লোকজনের দ্বারা লজ্জিত অপমানিত হচ্ছো। পাক হানাদারদের ক্যাম্পে আমার মৃত্যু হলে তোমাদেরকে এহেন বিব্রতকর পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হতো না। সমাজের রক্ত চক্ষু থেকে তোমাদের রেহাই দিতে আমি অজানা পথে পা বাড়ালাম। কেঁদো না মা! আজ থেকে তোমাদের আদরের শিউলী মরে গেছে। শিউলীফুল রাতে ফোটে, সূর্যোদয়ের আগেই ঝরে পড়ে।'

–শিউলী

ঘর হতে বের হয়ে কোথায় যাবো, কি করবো কিছুই জানি না। আমাদের গ্রাম হতে দূরে পূর্ব দিকে একটি রেলস্টেশন আছে। রাতের আঁধারে অনেক পথ পাড়ি দিয়ে রেলস্টেশনে পৌঁছলাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই একটি ট্রেন এসে থামলো। তাতে উঠে বসলাম। ট্রেন অনেকক্ষণ চলার পর আমাদের কামরায় টি টি আই এসে আমার কাছে টিকিট চাইলো। ভাষাহীন প্রাণির মতো তাকিয়ে রইলাম। আমার অবস্থা দেখে, টিকিট না থাকায় আমাকে ট্রেন হতে নামিয়ে দিলো। স্টেশন হতে কিছুদূর যেতেই চোখে পড়লো মিশনারী হাসপাতাল। এরই বারান্দায় কাপড়ের পুটলি মাথায় দিয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম। ঘুম ভাঙলো এক মহিলার ডাকে। মহিলার পরনে নীল পাড়ের সাদা শাড়ি।

আমার অবস্থা দেখে এরা আমাকে মিশনারী হাসপাতালে ভর্তি করে নিল। প্রকৃত ঠিকানা গোপন করে বললাম, আমি পাক সেনাদের দ্বারা ধর্ষিতা অসহায় সম্বলহীন এক মহিলা। পৃথিবীতে আমার কেউ নেই। ভ্রূণ হত্যা করতে চাইলে মিশনারী কর্তৃপক্ষ তা করতে অস্বীকার করলো। শুনালেন এদের যীশুর জন্ম কথা। মিশনারী হাসপাতালে সেবাযত্নে ভালভাবেই আমার দিন অতিবাহিত হতে থাকে। অবশেষে আমার গর্ভে নব জাতকের জন্ম হলো। চেহারায় ঘৃণিত পাক আর্মি অফিসারের প্রতিচ্ছবি দেখে ঘৃণায় আমার শরীর রি রি করে উঠলো। আমার বিছানায় শিশুটি অনেক কান্নাকাটি করলেও আমি পাশ ফিরে শুয়ে থাকতাম। নার্সরা এসে কোলে নিয়ে কান্না থামাতো। তারা বহুভাবে বুঝাতে চাইলেও আমি কোনভাবেই শিশুটিকে সহ্য করতে পারতাম না। যত দিন যেতে থাকে শিশুটির চেহারায় ঘৃণিত পাক সেনার চেহারা স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হচ্ছিল।

জীবনের দুর্দশার কথা চিন্তা করে আমার সমস্ত রাগ, ক্ষোভ ও ঘৃণা এই শিশুটির উপর গিয়ে পড়লো। এক রাতে শিশুটিকে ঘুমন্ত অবস্থায় হাসপাতালের বিছানায় রেখে সে রাতেই সবার চোখ এড়িয়ে রেল স্টেশনের দিকে ছুটলাম। স্টেশনে দাঁড়ানো একটি ট্রেনে উঠে পড়লাম। ট্রেন ছেড়ে দিল। বাইরে অঝোরে বৃষ্টি হচ্ছে। ট্রেনের এক কোণে বসে দুলতে দুলতে অজানার উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। ট্রেনে এক মহিলা অনেকক্ষণ ধরেই আমাকে লক্ষ্য করছিল। এক সময়

সে আমার গন্তব্যস্থল জানতে চাইলো। এর কোন সদুত্তর আমার ছিল না। চুপ করে রইলাম। মহিলা আমাকে খুব খাতির যত্ন করতে লাগলো। বললো– 'মনে হয় তোমার যাবার কোথাও জায়গা নেই। আমার সাথে চলো, তোমাকে একটি স্থায়ী ঠিকানায় পৌঁছে দেবো। সেখানে তোমার থাকা খাওয়ার কোন অসুবিধা হবে না।' মিশনারী মহিলাদের সেবা যত্নের কথা মনে করে ভাবলাম সব নারীদের বুঝি একই রূপ। অনিশ্চিত ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে একটি স্থায়ী ঠিকানা ও থাকা খাওয়ার নিশ্চয়তা পেয়ে আমি রাজি হলাম কিন্তু 'দুষ্ট লোকের মিষ্টি কথায় রাজি' হয়ে বাকি জীবনে এর খেরাসত দিতে হয়েছে। ট্রেন টঙ্গী স্টেশনে এসে থামলো। ট্রেন হতে নেমে মহিলা আমাকে নিয়ে আবদুল্লাহপুর বাস স্ট্যান্ডে এসে বাসে উঠলেন। সেই বাসের শেষ গন্তব্যস্থলে নেমে রাস্তা পার হলেন। 'আরিচাঘাট' 'আরিচাঘাট' বলে তারস্বরে হেলপার চীৎকার করছে। আমরা সেই বাসে উঠে বসলাম। কতো জায়গা বাস থামলো। কতো জন নামলো, কতো নতুন মানুষ বাসে উঠলো। একসময় আরিচাঘাটে এসে বাস থামলো। বিশাল নদী। লঞ্চে পাড়ি দিয়ে দৌলতদিয়া ঘাটে এসে নামলাম। অর্ধমাইল পথ পায়ে হেঁটে একটি পল্লীতে এসে এই মহিলা আমাকে উদ্দেশ্য করে বললো আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত তুমি এখানে থাকবে। কোথাও যাবে না। বেশ কিছুক্ষণ পর মহিলা ফিরে এসে বললো– চলো! আমার সাথে। এদিক সেদিক তাকাবে না। আদেশ মতো পিছু পিছু চলছি। দু' পাশের ঘরগুলোতে মহিলা-পুরুষদের অশালীন আচরণ আমাকে বিস্মিত করেছে। মহিলা এখানকার এক মহিলার নিকট এসে বললো– 'খালা! চেয়ে দেখ, আমি যা বলেছি তা শতভাগ সত্য কিনা।' আর আমাকে উদ্দেশ্য করে বললো– 'তুমি এখন থেকে খালার কথামতো চলবে। একটু এদিক সেদিক করবে না।' এই বলে মহিলা বিদায় হয়ে গেল।

কথিত খালা আমাকে খুব খাতির করে খেতে দিয়ে বললো, 'খেয়ে দেয়ে বিশ্রাম করো। সময় মতো ডাকবো। কতক্ষণ ঘুমিয়েছিলাম মনে নেই। তবে সেই খালার ডাকে ঘুম ভাঙলো। বললো, 'সেজে গোজে তৈরি হ। খদ্দর ধরতে হবে।' আমি কিছু বুঝতে না পেরে তাকিয়ে রইলাম। মুখ খিচিয়ে বললো– 'কচি খুকি! যেন কিছুই বুঝে না। তোমাকে দিয়ে অনেক টাকা কমাই করবো বলেই তোমাকে ঐ মহিলার নিকট হতে অনেক টাকায় কিনেছি। কবুতরের খোপরির মতো ঘর দেখিয়ে বললো এই ঘরে থাকবে। তিনবেলা খাবার পাবে। আমার কথা মতো খদ্দরের মনোরঞ্জন করবে। কোন প্রকার ওজর আপত্তি চলবে না।'

এসব সর্দারনিদের পুরুষ দালাল বাইরে পাহারায় থাকে। কেউ এই নরককুণ্ড হতে পালাতে চাইলে দালালদের হাতে ধরা পড়ে। মারধোর করে সর্দারনিরদের নিকট ফিরিয়ে নিয়ে আসে। বিভিন্ন শাস্তি ভোগ করতে হয়। এই জীবনে অসুস্থতা বলে কিছুই নেই। অসংখ্য দুঃখ বেদনা ও চোখের জলে দীর্ঘ পয়ত্রিশটি বছর

পুরুষের ভোগের সামগ্রী হয়ে এই নরককুণ্ডে থেকেছি। কত অরুচিপূর্ণ ও অশ্লীলতার সেই জীবন; যা পাক বাহিনীর নারী নির্যাতনকেও হার মানায়। আমের রস ফুরিয়ে গেলে আঁটি যেমন ফেলে দেয়, তেমনি রূপ যৌবন ফুরিয়ে গেলে নরককুণ্ড হতে মেয়েদের ঝাটিয়ে-তাড়িয়ে বিদায় করে দেয়। এই সময় মৃত্যু হলে চাটাইয়ে মুড়িয়ে নদীতে ভাসিয়ে দেয় আর বেঁচে থাকলে আমার মতো ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে বাকী জীবন কাটাতে হয়।

সরকারি খাসজমিতে এক সুহৃদ ব্যক্তি একখানি ছোট ঘর তুলে দিয়েছে। সারাদিন গ্রামে গ্রামে ভিক্ষা করে যা পাই কচু, ঘেচু, শাক ইত্যাদি জোগাড় করে সিদ্ধ করে খেয়ে রাত কাটাই। কেউ এক মুঠো খেতে দিলে তা-ই তৃপ্তিসহ খেয়ে দিনগুজার করি।

দেশ স্বাধীন হয়েছে। স্বাধীন দেশে সুখের সংসার গড়ে তুলতে কতো মানুষ কতোভাবে স্বপ্ন দেখছে। গ্রাম বাংলার আর দশটা মেয়ের মতো আমারও স্বপ্ন ছিল স্বামী ছেলে মেয়ে নিয়ে একটি সুখের সংসার গড়বো বলে। কিন্তু আমার কোন অপরাধে এতো দুঃখ কষ্টে দিন কাটাচ্ছি? জীবনভর কলঙ্কের বোঝা বয়ে বেড়াচ্ছি?

কথা বলতে বলতে শিউলী হাফিয়ে উঠলো। এক গ্লাস পানি ঢক ঢক করে পান করে লাঠিতে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়ালো। এমন সময় পাশের ঘর হতে কে যেন জোরে আবৃত্তি করছে–

"তুমি আসবে বলে, হে স্বাধীনতা/ সাকিনা বিবির কপাল ভাঙল/ সিথির সিদুঁর মুছে গেল হরিদাসীর/ তুমি আসবে বলে হে স্বাধীনতা।" –শামসুর রাহমান

কবিতার এই পংক্তিগুলো শুনে শিউলী বেগম আপন মনে বিড়বিড় করে বলে উঠে– "হে স্বাধীনতা! তুমি আসবে বলে শিউলী বিবির কপাল ভাঙলো। মুছে গেল জীবনের সুখ। কপালে লেপন করে দিয়ে গেল কলঙ্কের কালিমা। সারাজীবন কাঁধে চাপিয়ে দিয়ে গেল দুঃখের বোঝা। এ বয়সে কোথায় দাঁড়াবো? কোথায় পাবো একটু আশ্রয়? কে দিবে একটু খানি ঠাঁই"?

অনিশ্চিত জীবনের কথা ভেবে শিউলীর চোখ পানিতে ছলছল করে উঠলো। দুপুর গড়িয়ে সূর্য পশ্চিমাকাশে হেলে পড়েছে। দু' চোখের জলে কপোল বেয়ে পড়তে লাগলো। সূর্য রশ্মি তাতে পড়ে অব্যক্ত বেদনাকে উদ্বেলিত করে তুললো। ব্যথাতুর কণ্ঠে শিউলী গেয়ে উঠলো–

"এই দুনিয়া কঠিন ঠাঁই, দুঃখ বলার জায়গা নাই।
আমার মুখ দেখে যে দুঃখ বুঝে, এমন বান্ধব কোথায় পাই।"♦

বাংলাদেশের বাঙালির অনিবার্য গ্রন্থ

আনোয়ার কবির

বাঙালি জাতির ইতিহাসে সর্বশ্রেষ্ঠ অর্জন বাংলাদেশের স্বাধীনতা। পৃথিবীর অসংখ্য জাতি গোষ্ঠী একটি স্বাধীন ভূখণ্ডের অধিকারী হতে পারেনি। অত্যাচার নির্যাতন সহ্য করেও পায়নি কাঙ্ক্ষিত মুক্তির স্বাদ। এক্ষেত্রে বাঙালি জাতি অসম্ভব ভাগ্যবান। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মতো ক্যারিশমাটিক নেতার নেতৃত্বগুণে **১৯৭১** সালের **১৬** ডিসেম্বর বাঙালিরা অর্জন করেছে তাদের কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা। কাঙ্ক্ষিত দেশ বাংলাদেশ। যতদিন বাঙালি জাতিগোষ্ঠী থাকবে ততদিন অনিবার্যভাবে পাঠ করতে হবে তাঁদের ইতিহাস ঐতিহ্য সংস্কৃতির গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়কে।

বর্তমানে বাংলাদেশ উদযাপন করছে তার সুবর্ণ জয়ন্তী। একইসাথে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবর্ষ 'মুজিববর্ষ'। ইতোমধ্যে বাংলাদেশের ইতিহাস ঐতিহ্য গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়ের সাথে সংশ্লিষ্ট অসংখ্য গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। যে গ্রন্থগুলো ব্যতীত বাংলাদেশ বাঙালি জাতির ইতিহাস ঐতিহ্যের চর্চা থাকবে অসম্পূর্ণ। আজ আমরা এরকম চারটি অনিবার্য গ্রন্থ নিয়ে একটি সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা করার প্রয়াস চালাবো−

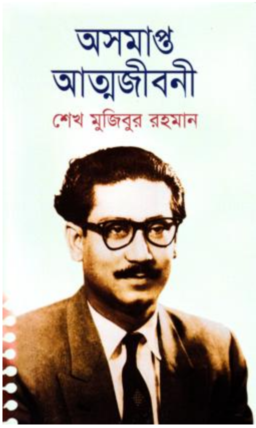

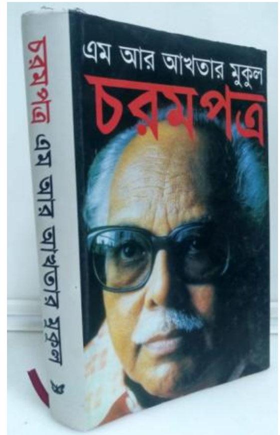

অসমাপ্ত আত্মজীবনী

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অনন্য অসাধারণ কাজ অসমাপ্ত আত্মজীবনী। বাঙালির সংগ্রামের ইতিহাস ঐতিহ্যের অন্যতম স্মারক এই বই। একজন নেতার বেড়ে ওঠা, রাজনীতি, দেশপ্রেম জনগণের প্রতি ভালোবাসার এক অনুপম দলিল এই গ্রন্থ। বঙ্গবন্ধু হলেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি। একথা বলার আর অপেক্ষা রাখে না বঙ্গবন্ধুর জীবনী বিহীন বাংলাদেশ পাঠটি অসম্পূর্ণ। সুতরাং বাংলাদেশকে বাঙালিকে জানতে হলে অনিবার্যভাবে অবশ্যম্ভাবী পাঠ্য জাতির পিতার অনন্য অসাধারণ সৃষ্টি অসমাপ্ত আত্মজীবনী।

চরমপত্র

বাংলাদেশের বাঙালির জীবনের সবচেয়ে গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় তার মুক্তিযুদ্ধ। আর মুক্তিযুদ্ধের অসামান্য দলিল এম আর আখতার মুকুলের চরমপত্র। আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের সময়ে স্বাধীনবাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত চরমপত্র ছিল অবরুদ্ধ বাংলাদেশসহ সারাবিশ্বের বাঙালির অন্যতম অনুপ্রেরণার অনুষ্ঠান। একটি অনুষ্ঠান, একটি কথিকা কিভাবে সাধারণ মানুষকে উজ্জীবিত করে রাখে, আশার বাতি জ্বালিয়ে রাখে, চূড়ান্ত প্রত্যাশার দিকে এগিয়ে যেতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে তার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ চরমপত্র। ঢাকার আঞ্চলিক ভাষায় পাকিস্তানি বাহিনী ও তাদের তাবেদারদের ব্যাঙ্গোক্তি এবং মুক্তিযোদ্ধাদের সাহসিকতার বিবরণ বা কতকতা এই চরমপত্র। মুক্তিযুদ্ধের সময়ে স্বাধীনবাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত চরমপত্রগুলোর বই আকারে ইতিহাসের এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়কে ধারণ। বাঙালির বাংলাদেশের ইতিহাসের এক অনিবার্য সম্পদ এম আর আখতার মুকুলের চরমপত্র।

একাত্তরের দিনগুলি

শহীদ জননী জাহানারা ইমামের অনবদ্য সৃষ্টি একাত্তরের দিনগুলি। মহান মুক্তিযুদ্ধের সময়ে অবরুদ্ধ ঢাকা'র অনুপম চিত্র পাওয়া যায় বইটিতে। একদিকে প্রচণ্ড নিপীড়ন ভয়াবহ অবস্থা অপরদিকে স্বাধীনতা সূর্যের আকাঙ্ক্ষায় প্রত্যাশারত বাঙালি বাংলাদেশের মানুষের এক নিপুণ চিত্র ধারণ করেছে বইটি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে কিশোরী আনা ফ্রাঙ্কের ডায়েরি আমাদের কাছে জীবন্ত করে রেখেছে সে সময়ের আনা ফ্রাঙ্কের শহরকে। বিশ্বজুড়ে আনা ফ্রাঙ্কের ডায়েরির ভেতর দিয়ে জীবন্ত তার স্মৃতি, জীবন্ত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। আনা ফ্রাঙ্কের ডায়েরি নিয়ে বিশ্বজুড়ে রচিত হয়েছে অসংখ্য নাটক উপন্যাস সিনেমা। জাহানারা ইমামের একাত্তরের দিনগুলোও আমাদের মুক্তিযুদ্ধে অবরুদ্ধ ঢাকা'র জীবন্ত ইতিহাস। আনা ফ্রাঙ্কের ডায়েরির মধ্যে কিশোরীসুলভ যে বিষয়গুলো পাওয়া যায় তার থেকে সম্পূর্ণ ব্যতিক্রমী একাত্তরের দিনগুলি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় আনা ফ্রাঙ্ক ছিলেন কিশোরী আর আমাদের মহান মুক্তিদ্ধের সময় জাহানারা ইমাম একজন পূর্ণ মানুষ।

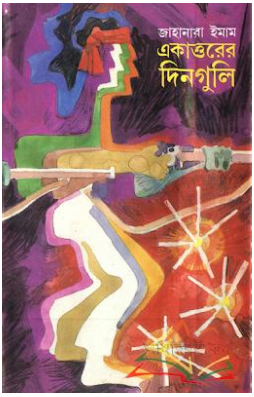

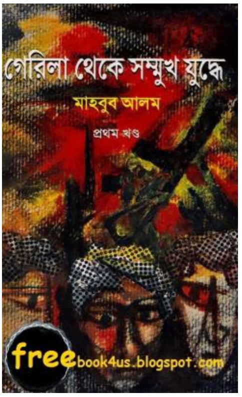

দু' সন্তান রুমী-জামী ও স্বামী শরীফ ইমামকে নিয়ে তার সুখের সংসার। তবে যুদ্ধ যেরকম সবকিছু উলটপালট করে দেয়। তেমনি জাহানারা ইমামের জীবনকেও উলটপালট করে দিয়েছে। যুদ্ধে অবরুদ্ধ ঢাকাতেই তার চোখের সামনে নিজ বাড়ি থেকে স্বামী শরীফ ইমাম ও মুক্তিযোদ্ধা সন্তান রুমীকে তুলে নিয়ে যায় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী। স্বামী শরীফ ইমাম পাকিস্তানি নির্যাতন সহ্য করে ফিরে এলেও মূলত সে নির্যাতনেই চূড়ান্ত বিজয়ের আগে মৃত্যুবরণ করেন। আর সন্তান রুমী পাকিস্তানি হায়েনাদের হাতে বাংলার অসংখ্য মুক্তিযোদ্ধাদের মতো লাশবিহীন শহীদ হয়ে যান। কিশোরী আনা ফ্রাঙ্ক-এর ডায়েরিতে তার পরিবারের ত্যাগ তিতিক্ষার মতোই একাত্তরের দিনগুলোতেও জাহানারা ইমাম

তার পরিবার, ঢাকার গেরিলা যুদ্ধ, স্বামী শরীফ ইমাম, সন্তান রুম-জামী, রুমী'র মুক্তিযোদ্ধা বন্ধুদের মধ্য দিয়ে জীবন্তভাবে তুলে ধরেছেন একাত্তরের ঢাকা'কে। আর তাই বাংলা সাহিত্যের অন্যতম কথাশিল্পী সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় তার 'পূর্ব-পশ্চিম' গ্রন্থের একটি বড় অংশই লিখেছেন জাহানারা ইমামের একাত্তরের দিনগুলি থেকে। একথা নির্দ্ধিধায় বলা যায় ভবিষ্যতেও আমাদের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে যত নাটক সিনেমা উপন্যাস লেখা হবে তার অন্যতম আকর গ্রন্থ হতে পারে একাত্তরের দিনগুলো।

গেরিলা থেকে সন্মুখ সমরে

আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের রণাঙ্গনের অন্যতম দলিল গেরিলা যোদ্ধা মাহবুব আলম-এর দু'খণ্ডে লেখা গেরিলা থেকে সন্মুখ যুদ্ধে গ্রন্থটি। আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধ সকল বিচারেই মহাকাব্যিক। আর ইতিহাসে মহাকাব্যিক বিষয়ে নানা মাত্রার লেখা সংযোজিত হয়। ইতিহাস, রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি, প্রান্ত জনের ভূমিকা, অবস্থান সকল কিছুই মহাকাব্যের উপাদান। মহাকাব্যকে ধারণ করা ঘটনার সকল দিক নিয়েই রচিত হয় আলাদা আলাদা মহাকাব্য। ব্যক্তিগত স্মৃতিচারণের মধ্য দিয়ে ওঠে আসে ইতিহাস, সমাজ বাস্তবতা। ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন দিক নিয়ে লেখা হয়েছে অসংখ্য গ্রন্থ। যদিও সংখ্যাতত্ত্বের বিচারে হয়তো তেমন বড় কোন সংখ্যা নয়। তবে একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় ১৯৭১ সাল নিয়ে উপন্যাস, ইতিহাস, স্মৃতিকথা, সরাসরি যুদ্ধের বিবরণ, মুজিবনগর সরকার, অবরুদ্ধ ঢাকাসহ নানাদিক নিয়ে কয়েকটি মহাকাব্যিক গ্রন্থও প্রকাশিত হয়েছে। যার মধ্যে ধারণ করা হয়েছে সময়, রাজনীতি, প্রেক্ষাপট, জনগণের সংগ্রামসহ পুরো অধ্যায়কে। এই প্রেক্ষাপটে গেরিলা থেকে সন্মুখ যুদ্ধে মুক্তিযুদ্ধে জনযুদ্ধের ইতিহাসে সবচেয়ে গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়কে মহাকাব্যিকভাবে ধারণ করা সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। গেরিলা কমান্ডার মাহবুব আলম তার সকল আবেগ, অনুভূতি, পর্যক্ষেণ বাস্তবতা দিয়ে তৈরি করেছেন এ গ্রন্থ। স্মৃতিকথার মধ্যে দিয়ে তিনি লিখেছেন এই মহাকাব্য। জীবন ঘনিষ্ঠ, জীবনযুদ্ধ সরাসরি মাঠ থেকে তুলে নিয়ে আসা এ গ্রন্থ যে কোন জনযুদ্ধের একটি সমৃদ্ধ ও ঐতিহাসিক দলিল। একটি জনযুদ্ধ কীভাবে সংঘটিত হয় সেটি তত্ত্বের বাইরে সরাসরি তৃণমূল পর্যায় থেকে তুলে ধরা হয়েছে এ গ্রন্থে।

বাঙালি বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ ইতিহাস ঐতিহ্যের অন্যতম এই চারটি গ্রন্থ অনিবার্যভাবে যুগ যুগ ধরে প্রেরণা যোগাবে মুক্তিযুদ্ধের বাংলাদেশকে। প্রেরণা যোগাবে অনাগত ভবিষৎ প্রজন্মকে। বাংলাদেশ বাঙালির মুক্তিযুদ্ধ ইতিহাস ঐতিহ্যকে জানতে অবশ্য পাঠ্য গ্রন্থ চারটি। যে কোন বিচারে এই আঁকর অনিবার্য গ্রন্থগুলোর কোন বিকল্প নেই।♦

১৯ ডিসেম্বর ছান্দসিক কবি আবদুল কাদির এর মৃত্যুদিবস

ছান্দসিক কবি আবদুল কাদির
‘কম চেনা বড় মানুষ’

মঈনুল হক চৌধুরী

আবদুল কাদির বিশিষ্ট কবি, প্রাবন্ধিক, গবেষক ও সম্পাদক। ছান্দসিক কবি হিসেবেই তিনি সমধিক পরিচিত। বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা এবং সাহিত্য পত্রিকা শিখা’র অন্যতম প্রকাশক ও লেখক ছিলেন। তিনি রবীন্দ্র ও নজরুল উত্তর যুগে তথা তিরিশের দশকের শক্তিমান কবি। সাহিত্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁর বিচরণ ছিল। তিরিশের দশক থেকেই তিনি কবি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত এবং তাঁর মৃত্যুর দীর্ঘকাল পরেও আজ পর্যন্ত কবি হিসেবে খ্যাতিমান। বাংলা কাব্য সাহিত্য ও নজরুল-গবেষণায় উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে যাওয়া ছান্দসিক কবি আবদুল কাদির। বাংলা সাহিত্যে তাঁর অনেক অবদানের কথা পাদপ্রদীপের আলোকেই আসেনি। বিশিষ্টজনদের মতে কবি আবদুল কাদির একজন ‘কম চেনা বড় মানুষ’। ১৯০৬ সালের ১ জুন কুমিল্লা জেলার আড়াইসিধা গ্রামে জন্ম। পিতা হাজী আফসারউদ্দীন ছিলেন একজন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী। শৈশবে মাতৃহারা হওয়ার কারণে পিতার তত্ত্বাবধানেই তিনি বড় হন। তিনি ১৯২৩ সালে ব্রাহ্মণবাড়িয়া অন্নদা মডেল হাইস্কুল থেকে ম্যাট্রিক এবং ১৯২৫ সালে ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজ থেকে আইএসসি পাস করেন। ঢাকা কলেজে ইন্টারমেডিয়েট পড়াকালে

কলেজ ম্যাগাজিনে প্রকাশিত হয় প্রথম কবিতা 'মুক্তি'। 'মোহাম্মদী'-তে প্রকাশিত হয় কবিতা 'হযরত মোহাম্মদ', এটিই আবদুল কাদিরের প্রথম উল্লেখযোগ্য কবিতা। বলা যায়, ছাত্রাবস্থায়ই ঢাকা এবং কলকাতার বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় গদ্য-পদ্য লিখে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তার কিছুকাল পরেই ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত হয় মুসলিম সাহিত্যে সমাজের 'বুদ্ধিরমুক্তি' আন্দোলন। কাজী আবদুল ওদুদ ও আবুল হোসেনের নেতৃত্বে পরিচালিত এই আন্দোলনের একনিষ্ঠ সংগঠক ও কর্মী ছিলেন আবদুল কাদির। যার ফলে অদম্য সাহস আর কর্মোদ্যামে এগিয়ে যান সামনে। পরে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিএ শ্রেণিতে অধ্যয়ন করেন। উল্লেখ্য, আবদুল কাদির সাংবাদিক জীবন শুরু করেন সওগাত পত্রিকার মাধ্যমে। ১৯২৬ সালে সম্পাদনা বিভাগে চাকরি নেন আবদুল কাদির। ১৯৩০ সালে যোগ দেন কলকাতা কর্পোরেশনের একটি প্রাথমিক স্কুলে প্রধান শিক্ষক হিসেবে। ১৯৩৫ সালে রাজনীতিবিদ কমরেড মুজাফফর আহমদের কন্যা আফিয়া খাতুনকে বিয়ে করেন। সেই সময় সম্পাদক হিসেবে বের করেন মাসিক 'জয়তী' ও 'নবশক্তি'। কলকাতার বিখ্যাত 'যুগান্তর' পত্রিকায় যোগ দেন ১৯৩৮ সালে। ১৯৪২ সালে কাজী নজরুল ইসলামের 'দৈনিক নবযুগ' পত্রিকার বার্তা সম্পাদক নিযুক্ত হন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষদিকে সরকারের প্রচার সংস্থায় বাংলা অনুবাদকের পদে যোগদান করেন। সাপ্তাহিক 'মোহাম্মদী' ও অর্ধ সাপ্তাহিক 'পয়গাম' পত্রিকায় যোগ দেন ১৯৪৬ সালে।

পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকারের মুখপত্র মাসিক 'মাহে নও' পত্রিকায় কর্মজীবন শুরু করেন ১৯৫২ সালে। মাহে নও থেকে ১৯৬৪ সালে কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ডে প্রকাশনা কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগ লাভ করেন। ১৯৭০ সালে সরকারি চাকরি থেকে অবসর নেন। উল্লেখ্য, কবি আবদুল কাদির অন্তত তিনটি কারণে বাংলা সাহিত্যে অমর হয়ে থাকবেন : তাঁর খাঁটি কবিসত্তা, বাংলা ছন্দের উপর অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও সাহিত্য-সম্পাদনার ক্ষেত্রে অনন্যতা। মাত্র দুটি কাব্যগ্রন্থ দিলরুবা ও উত্তর বসন্ত বাংলা ভাষায় তাঁকে স্থায়ী আসন এনে দেয়। তাঁর কবিতা পাঠ করে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পর্যন্ত তাঁর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। ছিলেন বিখ্যাত মাহে নও পত্রিকার সম্পাদক। অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে সম্পাদনা করেছেন নজরুল রচনাবলি, যা এ দেশে নজরুল সাহিত্য সুপ্রতিষ্ঠিত হতে সাহায্য করেছে। এ ছাড়া সম্পাদনা করেছেন রোকেয়া রচনাবলি, শিরাজী রচনাবলি ও কাজী ইমদাদুল হক রচনাবলি, যার সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিক মূল্য অপরিসীম। বাংলা ছন্দ শাস্ত্রে আবদুল কাদিরের শ্রেষ্ঠত্ব হলো, তিনিই সর্বপ্রথম বাংলা ছন্দকে আধুনিক ও স্থায়ী নামে প্রতিষ্ঠিত করেন। প্রবোধচন্দ্র সেনের স্নেহধন্য ছন্দগবেষক আবদুল কাদির বাংলা ভাষার প্রাচীন ও নতুন ছন্দের

পুস্তকসমূহ অধ্যয়ন করে বাংলা ছন্দের নতুন গ্রহণযোগ্য নামকরণে সক্ষম হন। বাংলা ভাষার মূল তিনটি ছন্দের নাম নিয়ে ছান্দসিকদের মধ্যে ছিল প্রচুর মতভেদ। অক্ষরবৃত্তকে রবীন্দ্রনাথ বলতেন সাধুরীতির পয়ার-জাতীয় ছন্দ, সত্যেন্দ্রনাথ বলতেন, গাঙ্গিনীতরণ পদ্ধতি, মোহিতলাল মজুমদার বলতেন, সাধুভাষার পাদ-ভূমক ছন্দ, প্রবোধচন্দ্র সেন বলতেন, বিশিষ্ট কলামাত্রিক বা মিশ্রকলাবৃত্ত। মাত্রাবৃত্তকে রবীন্দ্রনাথ বলতেন, ব্রজবুলি-ভাঙা তিন মাত্রার ছন্দ, সত্যেন্দ্রনাথ বলতেন, গঙ্গা-যমুনা পদ্ধতি, মোহিতলাল মজুমদার বলতেন, সাধুভাষার গীতিচ্ছন্দ বা পর্বভূমক ছন্দ, প্রবোধচন্দ্র সেন বলতেন, যথার্থ কলামাত্রিক বা সরল কলাবৃত্ত। স্বরবৃত্তকে রবীন্দ্রনাথ বলতেন, বাংলার প্রাকৃত ছন্দ বা ছড়ার ছন্দ, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত বলতেন, ঝরনা-ঝামর পদ্ধতি, মোহিতলাল মজুমদার বলতেন, প্রাকৃত ভাষার পর্বভূমক ছন্দ, প্রবোধচন্দ্র সেন বলতেন, বিশিষ্ট দলবৃত্ত বা দলমাত্রিক। আবদুল কাদির এ প্রেক্ষাপটে বলেন, 'আমি এ সকল পরিভাষা-ভেদ পরিহার করে, অক্ষরবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত ও স্বরবৃত্ত, এই তিন সহজবোধ্য ও সর্বত্র চলিত নামই গ্রহণ করেছি। কেননা, আমার ধারণা যে, অন্যথা সাধারণ পাঠকেরা পরিভাষাগত জটিলতা ও বিভ্রান্তির আবর্তে পড়ে হতচকিত হতে পারেন।' সেই থেকে বাংলা ভাষার প্রধান তিন ছন্দের সর্বজনস্বীকৃত নাম হয়ে গেল– অক্ষরবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত ও স্বরবৃত্ত ছন্দ। ছন্দ সম্পর্কিত জ্ঞান যে কেবল কবিদের জন্য অপরিহার্য, তা নয়, কবিতার পাঠকদের জন্যও তা অত্যন্ত জরুরি। কারণ ছন্দের জ্ঞান না থাকলে পাঠকের পক্ষে কবিতা পাঠ করে প্রকৃত আনন্দ লাভ করা সম্ভবপর হয় না। অত্যন্ত ছন্দ-সচেতন কবিরাই যেমন খাঁটি কবি, অত্যন্ত ছন্দ-সচেতন পাঠকরাও তেমনি কবিতার খাঁটি পাঠক। কবি আবদুল কাদির এসব কারণে অমর হয়ে থাকবেন নতুন নতুন কবি ও নতুন নতুন পাঠকদের মাঝে। কবি আবদুল কাদির বাংলা ছন্দের উপর ৪৫ বছরে মোট ৮০টি প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন। সেগুলো থেকে বাছাই করে সাতটি প্রবন্ধ দিয়ে প্রকাশ করেছিলেন তাঁর অমর গ্রন্থ ছন্দ-সমীক্ষণ। পরবর্তীতে বাংলা একাডেমি থেকে প্রকাশিত তাঁর রবীন্দ্রনাথের ছন্দ বাংলা ছন্দের উপর আরেকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। তাঁর ৮০টি প্রবন্ধ একত্রিত করে যদি আলাদা একটি গ্রন্থ প্রকাশ করা যেত, তাহলে সেটা হতো একটা বিস্ময়কর পাওয়া, কবি ও সাধারণ পাঠক উভয়েরই জন্য বলা যায়।

তরুণ বাঙালি কবিদের জন্য ছন্দের যে গ্রন্থগুলো পাঠ করা অত্যাবশ্যক, তার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের ছন্দ, প্রবোধচন্দ্র সেনের ছন্দ-পরিক্রমা, আবদুল কাদিরের ছন্দ-সমীক্ষণ, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর কবিতার ক্লাস উল্লেখযোগ্য। তবে যে গ্রন্থটি আদ্যোপান্ত পাঠ করতে পারলে বাংলা ছন্দের সমস্ত শাখা-প্রশাখা

বিস্তারিত জানা সম্ভব এবং পাঠ না করলে বাংলা ছন্দ সম্পর্কে অপূর্ণতাই রয়ে যায়, সেটি আবদুল কাদিরের 'ছন্দ-সমীক্ষণ'। আবদুল কাদিরের 'ছন্দ-সমীক্ষণ' বাংলা ভাষার তরুণ কবিদের জন্য বাইবেলস্বরূপ। আবদুল কাদিরের কবিতা পাঠ করে আমাদের যতটা না বিস্মিত হতে হয়, তার চেয়ে বেশি বিস্মিত হতে হয় তাঁর ছন্দ বিষয়ক যে কোনো প্রবন্ধ পাঠ করে। বাংলা ছন্দ নিয়ে তাঁর যে চুলচেরা বিশ্লেষণ ও গবেষণা, তা অনেকটা বিজ্ঞানীর মতো। তিনি কেবল থিওরি তৈরি করেই ক্ষান্ত হননি, ল্যাবরেটরিতে নিয়ে তা প্রমাণ করতেও প্রস্তুত থাকেন। 'মুক্তক অক্ষরবৃত্ত ছন্দ' শীর্ষক প্রবন্ধে তিনি রবীন্দ্রনাথের দুটি কবিতার অংশবিশেষ নিয়ে যে ছন্দের কারুকাজ দেখিয়েছেন, তা এককথায় বিস্ময়কর। আবদুল কাদিরের এ গবেষণাকর্ম দেখলে রবীন্দ্রনাথও বিস্ময়ে অভিভূত না হয়ে পারতেন না। আবদুল কাদিরের পঠনপাঠন ছিল কত যে গভীর, তার পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর ছন্দবিষয়ক প্রতিটি প্রবন্ধের পরতে পরতে। 'বাংলা সনেটের রূপ ও রীতি' প্রবন্ধে বাংলা চতুর্দশপদী কবিতার প্রাচীন ও আধুনিক রূপ এবং এর আকার প্রকার নিয়ে যে চিত্র তিনি তুলে ধরেছেন তার তুলনা মেলা ভার। তিনি প্রমাণ করে দেখিয়েছেন, চতুর্দশ পঙক্তির কবিতা বাংলা ভাষায় মধুসূদনের পূর্বেও ছিল। ইংরেজি সনেট অবশ্য রচিত হয় আইয়াম্বিক পেন্টামিটারে (১০ সিলেবল বিশিষ্ট পঙক্তি), মধুসূদন সেখানে অনুসরণ করেন চৌদ্দ অক্ষর। তবে বাংলা ভাষায় পরবর্তীকালে চৌদ্দ অক্ষর ছাড়াও ষোলো অক্ষর, আঠারো অক্ষর, বিশ অক্ষর, বারো অক্ষর ও দশ অক্ষরেও পঙক্তি-বিন্যাস করে যে সনেট লেখা হয়েছে তার উদাহরণ তুলে ধরেন আবদুল কাদির। এমনকি অক্ষরবৃত্ত ছাড়াও স্বরবৃত্ত ও মাত্রাবৃত্তেও যে সনেট রচিত হয়েছে বাংলায়, তা তিনি দেখিয়ে দেন, আধুনিককালে অবশ্য ২২, ২৪, ২৮, ৩০, ৩২ মাত্রার সনেটও রচিত হয়েছে বাংলা ভাষায়। আরেক জন আবদুল কাদিরের আবির্ভাব না ঘটলে তা সব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে কে বা দেখাবে কবিতার সাধারণ পাঠককে! অসামান্য এ ছন্দ-গবেষক সম্বন্ধে বিশ্বভারতীর রবীন্দ্র-অধ্যাপক ছন্দবিজ্ঞানী প্রবোধচন্দ্র সেন যথার্থই বলেছিলেন: 'প্রবীণ কবি-ছান্দসিক আবদুল কাদির একজন বহুবিৎ বিদগ্ধ ব্যক্তি। ইংরেজি ও বাংলা সাহিত্যের আনাচে-কানাচে তাঁর অবাধ বিচরণ। ইংরেজি, সংস্কৃত-প্রাকৃত ও আরবি ছন্দশাস্ত্রেও তাঁর অধিকার সুবিস্তৃত। তাঁর বাংলা ছন্দের জ্ঞান শুধু অধীত বিদ্যালব্ধ নয়, সুদক্ষ ছন্দশিল্পী হিসাবেও তিনি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের সমাদর লাভ করেছেন।' কেবল ছন্দ-গবেষণার জন্য নয়, তাঁর মৌলিক সাহিত্যকর্মের জন্যে। পরে দেখা যায়, গবেষক হিসেবে আবদুল কাদিরের নিষ্ঠা ও যোগ্যতার পরিচয় পাওয়া যায় নজরুল, আবুল হুসেন, ইমদাদুল হক, লুৎফর রহমান, সিরাজী, রোকেয়া রচনাবলি সম্পাদনাসহ ব্যতিক্রম কাজ ও

আলোচনায়। তাঁর ছন্দ-সমীক্ষণ, মতিউর রহমান বক্তৃতামালারূপে প্রদত্ত বাংলা ছন্দের ইতিবৃত্ত ও আধুনিক কবিতার ছন্দ– এই গ্রন্থগুলো ছন্দ বিষয়ে আবদুল কাদিরের অধ্যয়ন ও প্রজ্ঞার স্বাক্ষর বহন করে। তাছাড়া তাঁর ছন্দ-কৃতিত্বের জন্য রবীন্দ্রনাথের অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করেছিলেন। তিনি যে শুধু একজন ছন্দকৃতী কবি তা নয়, সুদক্ষ ছান্দসিক হিসেবেও তাঁর স্থান সর্বোচ্চ পর্যায়ে। বস্তুত উভয় বাংলায় তাঁর সমকক্ষ কৃতী ছান্দসিক অতি বিরল। জনশ্রুতি আছে ছন্দ-রচনা ও ছন্দ-বিশ্লেষণ, এই উভয় ক্ষেত্রে সমান দক্ষতার বিচারে সত্যেন্দ্রনাথের পরেই তাঁর স্থান।

আর কবিতা নিয়ে কবি জসীমউদ্দীনের কথাটি বিশেষভাবে উল্লেখ্যযোগ্য : “কবি আবদুল কাদিরের ভাষার গাঁথুনি যে-কোনো ভালো কবির অনুসরণীয়। ভাষার সুকঠোর বাঁধুনির অন্তরালে কবি তাঁর কাব্যখানি লুকাইয়া রাখেন, যাঁহারা এই বর্ম ভাঙ্গিয়া ভিতরে প্রবেশ করিতে পারিবেন তাঁহারা কবির কাব্য মুশায়েরার রঙ্গিন বাতিটির আলোকে উদ্ভাসিত হইবেন এ-বিষয়ে সন্দেহ নাই।” আবদুল কাদির অনেক কবিতা ও প্রবন্ধ রচনা করেছেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য কবিতা ও প্রবন্ধগ্রন্থ হলো– দিলরুবা (১৯৩৩), উত্তর বসন্ত (১৯৬৭), কবি নজরুল (১৯৭০), ছন্দসমীক্ষণ (১৯৭৯), কাজী আবদুল ওদুদ (১৯৭৬), বাংলা ছন্দের ইতিবৃত্ত (১৯৮৫), যুগকবি নজরুল (১৯৮৬) ইত্যাদি। এগুলির মধ্যে সাহিত্য সমালোচনা ও ছন্দবিষয়ক গ্রন্থও রয়েছে। তিনি বাংলা ছন্দ বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা ও সামগ্রিক বিশ্লেষণ করেছেন, যা তাঁর ছন্দসমীক্ষণ গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। আবদুল কাদির বেশসংখ্যক রচনাবলি সম্পাদনার কৃতিত্ব অর্জন করেন, যেমন– কাব্যমালঞ্চ (যুগ্মভাবে, ১৯৪৫), এয়াকুব আলী চৌধুরী রচনাবলী (১৯৬৩), নজরুল রচনাবলী (৫ খণ্ড, ১৯৬৬-১৯৮৪), শিরাজী রচনাবলী (১৯৬৭), কাজী ইমদাদুল হক রচনাবলী (১৯৬৮), আবুল হুসেন রচনাবলী (১৯৬৮), লুৎফর রহমান রচনাবলী (১ম খণ্ড, ১৯৭২), রোকেয়া রচনাবলী (১৯৭৩), বাংলা সনেট (১৯৭৪) ইত্যাদি। সাহিত্য সাধনার স্বীকৃতিস্বরূপ আবদুল কাদির বাংলা একাডেমী সাহিত্য পুরস্কার (১৯৬৩), আদমজী সাহিত্য পুরস্কার (১৯৬৭), একুশে পদক (১৯৭৬), নজরুল একাডেমী স্বর্ণপদক (১৯৭৭), কুমিল্লা ফাউন্ডেশন পদক (১৯৭৭), মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন স্বর্ণপদক (১৯৭৭) ও মুক্তধারা পুরস্কার লাভ করেন। উল্লেখ্য, আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামকে আবদুল কাদির সহযোদ্ধা, সহকর্মী, অকৃত্রিম বন্ধু হিসেবে পেয়েছিলেন। নজরুলের সান্নিধ্য ও স্নেহে সিক্ত ছিলেন কবি। আবদুল কাদির তার ‘নজরুলের জীবন ও সাহিত্য’ দীর্ঘ প্রবন্ধে তার ছন্দ মূল্যায়ন করেন। তিনি ১৯৮৪ সালের ১৯ ডিসেম্বর মৃত্যুবরণ করেন।♦